"তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর----।"

[সূরা আত্-তাহরীম (৬৬) : ৬]

আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ

আবদুল হামীদ ফাইযী

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

প্রণয়নে

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আলমাদানী
বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ

প্রকাশনায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

অধিকাংশ মানুষই অনুকরণপ্রিয়। নিত্য-নূতন সব কিছুকে গ্রহণ করতে সদা আগ্রহী, সদা প্রস্তুত। ভাল হোক চাহে মন্দ, সে বিবেক করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। অবশ্য তা সকলের পক্ষে করা সম্ভবও নয়। তাই তো অধিকাংশ মানুষেরই শ্লোগান হল, 'যেমনি কলি তেমনি চলি।' আর সে জন্যই নতুন কিছু পরিবেশে প্রবেশ করলেই তা অনেকের বরণীয় রীতি অথবা ফ্যাশন হয়ে যায়। নির্বিচারে তা গ্রহণ ও ব্যবহার করতে শুরু করে দেয়।

যাঁরা চোখ বুজে ভাল-মন্দ অভিনব সব কিছুই গ্রহণ করেন এবং ভাল হলেও পুরাতন সব কিছুই বর্জন করেন তাঁরাই 'প্রগতিশীল' বলে পরিচিত।

পক্ষান্তরে কিছু মানুষ আছেন; যাঁরা বাচ-বিচার করে বিভিন্ন নিত্য-নূতন অনুপ্রবেশকারী ফ্যাশন, ট্র্যাডিশন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে থাকেন। যা মন্দ তা বর্জন করেন, যা ভালো তা অর্জন করেন এবং যা চিরসত্য ও চিরন্তন সেই সভ্যতাকে আমরণ ধারণ করে থাকেন। যে সভ্যতাকে মানুষের সৃষ্টিকর্তা চিরন্তন বলে ঘোষণা করেছেন সে সভ্যতাকে সীমিত ও পরিবর্তনশীল জ্ঞানের অধিকারী কোন মানুষের কথায় বর্জন করেন না। আর সে জন্যই ওঁরা এঁদেরকে 'গোঁড়া' বা 'রক্ষণশীল' বলে আখ্যায়ন ও ব্যঙ্গ করে থাকেন। এর পশ্চাতে রয়েছে একটিই কারণ। আর তা হল মরণশীল মানুষের মরণের পরপারকে অবিশ্বাস করা, দ্বীন ও আল্লাহকে অস্বীকার করা।

ভুয়ো প্রগতিবাদীদের মোকাবেলা করে চলতে হলে ইসলামী পরিবেশ গড়ার ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলিমকে সচেতন হতে হবে। ইসলামী পরিবেশের সুফল এবং তথাকথিত প্রগতিশীল পরিবেশের কুফল বর্ণনা করার মাধ্যমে গণচেতনা গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী শিক্ষাকে জোরদার করে জোর পদক্ষেপে কুফ্‌রী পরিবেশকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে আরবী ভাষায় লিখিত 'ইসলাহুল বুয়ূত' ও 'আখতারুন তুহাদ্দিদুল বুয়ূত' এর অনুকরণে এ পুস্তিকা বাংলা ভাষায় লিখে বাঙালী পাঠক সমাজকে উপহার দিতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ যেন তা কবুল করে নেন। আমীন।

প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকে। যাকে আমরা গৃহ বলি। এই গৃহ আবাদ হয় দুই ভাবে; বাহ্যিকভাবে ও আভ্যন্তরিকভাবে।

বাহ্যিকভাবে গৃহ হবে সুন্দর, প্রশস্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, বৃষ্টি ও আগুন ইত্যাদি থেকে হবে নিরাপদ। আর আভ্যন্তরিকভাবে গৃহের সকল সদস্য হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত, দ্বীনদার ও সজাগচিত্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল হতে যেরূপ গৃহকে রক্ষা করার মানসে বিভিন্ন উপায় ও কৌশল অবলম্বন করতে

হয় ঠিক তদ্রূপই নিত্য-নূতন নানান্ ভ্রান্ত মতবাদ ও তথাকথিত সভ্যতার আক্রমণ ও সংক্রমণ হতে গৃহবাসীকে নিরাপত্তা দান করা মুসলিম গৃহকর্তার এক বড় কর্তব্য।

পরিবেশ মানুষকে যে শিক্ষা দেয় কোন পাঠ্যপুস্তক তা দিতে পারে না। পরিবেশ মানুষকে ভালো অথবা মন্দ করে গড়ে তুলতে পারে। কেউ না চাইলেও কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই তার মধ্যে এসে থাকে। আমাদের দেশে মহিলাদের বোরকা দেখে লোকেরা ভ্যাল্‌ভ্যাল্ করে বিস্ময়দৃষ্টি ও উপহাস নজরে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, গোবেচারী প্রাচীন যুগের সেকেলে মানুষ।

পক্ষান্তরে এমনও দেশ রয়েছে যেখানে বোরকার সাথে কাউকে তার চেহারা খুলে রাখতে দেখলে সাধারণ লোক তার প্রতি অবজ্ঞা দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবে, কারো খাদেমা (দাসী) বটে! পরিবেশের এই প্রভাবেই বহু অমুসলিম মহিলাও এ পরিবেশে এসে মুখ ঢাকা বোরকা ব্যবহার করেন।

আমাদের দেশে মুসলিম বলে দাবীদার কোন পরিবারকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, কেউ তো কলেমাই জানে না। কেউ বা তার অর্থ জানে না। কেউ নবীকে চিনে না। কেউ নামায পড়ে না। কেউ বা পড়লে 'আত্তাহিয়্যাতু' জানে না। কাউকে সূরা ফাতেহা পড়তে বললে, পড়তে শুরু করে, 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন, আর-রহমানির রহীম, মাঝে ফাঁকে বাদ দিয়ে অলাযযাল্লীন। আমীন।' আর এর অর্থই হল দ্বীনের প্রতি অবহেলা।

আর এই অবহেলার একটা কারণ হল প্রতিকূল পরিবেশ।

আমাদের পরিবেশকে ঘিরে রয়েছে ধর্মনাশা ও সর্বনাশা রাজনীতি। বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম ও মডেল ফ্যাশনের সাহায্যে সমাজকে যৌন-সুখের ভোগ দাও, যৌন-চেতনা প্রখর থেকে প্রখরতর কর। মানুষ কাজ করে খাক্ ; যার কাজ নেই তার রুটী নেই। সকলের ঘরে-ঘরে সুলভমূল্যে বিনোদন-যন্ত্র ঢুকিয়ে দাও, যাতে কাজের শেষে ঘরে ফিরলে তার মন যেন নেচে ওঠে। তাহলেই রুজী-রুটী, যৌন ও বিনোদন-চিন্তায় সে আর ধর্ম-চিন্তা করার সুযোগ পাবে না। মসজিদের মোকাবেলা কর বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্র, থিয়েটার, সিনেমা হল ও রঙমহল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ধর্মীয় পত্নীর মোকাবেলায় নানা প্রকার উপপত্নী-ভোগের সুযোগ বৃদ্ধি কর। আকীদার মোকাবেলা কর চিন্তা ও বাক্‌স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি দ্বারা।

জিহাদী শক্তি ও বিভিন্নমুখী প্রতিভার মোকাবেলা হোক খেলাধূলা ও বিলাস-ব্যসনের আতিশয্য দিয়ে। বিভিন্ন কর্ম-শিল্পীদের মোকাবেলা করুক বিভিন্ন রঙ্গ-শিল্পী; অভিনেতা-অভিনেত্রী ও গায়ক-গায়িকারা। উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত কর বিভিন্ন তসলিমা-রুশদীকে; যদিও তাদের চেলা-চামুণ্ডের সংখ্যা মোটেই কম নয়। তবে পার্থক্য এই যে, তারা মনের কথা পেটেই চেপে রেখেছে। আর ওরা তা উদ্‌গীরণ করে ফেলেছে! উক্তরূপ পরিবেশের বেড়া-জালে বন্দী থেকে, রেডিও, টি,ভি, পত্র-পত্রিকা ও আরো অন্যান্য প্রচার-মাধ্যমের মোকাবেলায় আমরা মুসলিমরা ইসলামী পরিবেশ গড়তে

কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পারি সে বিষয় ভেবে আমাদেরকে হীনন্মন্যতার শিকার হলে চলবে না। বরং আমাদেরকে এ কথা মনের মাঝে গেঁথে রাখতে হবে যে, আমাদের মাথার উপরে উড়ন্ত চিলকে আকাশে উড়তে যদি বাধা না-ও দিতে পারি তবুও আমরা আমাদের মাথার চুলে তাকে বাসা বাঁধতে কোন দিনই দেব না---একাজ তো অবশ্যই পারব।

কিন্তু যে বাড়ি ও পরিবেশের কথা এ পুস্তিকায় বলা হয়েছে তা গড়ে তোলা কি সকলের পক্ষে সম্ভব? হয়তো বা নয়। তবুও যাদের আর্থিক সঙ্গতি এবং আল্লাহভীরুতা আছে তাঁদের জন্য অবশ্যই সম্ভব ও সহজ। তাছাড়া যাঁরা যতটুকু সাধ্য রাখেন তাঁরা ততটুকু চেষ্টা করবেন।

আল্লাহ তাআলা সকলের চেষ্টার অন্তর দেখবেন। এ জন্যই তিনি বলেন,

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا } (١٦) سورة التغابن

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শোন, তার আনুগত্য কর----। (কুঃ ৬৪/১৬)

আর বলেন,

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (٢٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতার বাইরে দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। (কুঃ ২/২৮৬)

অতএব যার যতটুকু করার সাধ্য আছে তাকে ততটুকু কাজ করতে চেষ্টা না করার জন্য তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট আমাদের আকুল আবেদন যে, তিনি যেন আমাদের পরিবার ও পরিবেশকে সুন্দর করেন। চক্ষুশীতলকারী পরিজন দান করেন এবং কাল কিয়ামতে তাঁর আযাব থেকে অব্যাহতি দান করেন। আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
সফর ১৪১৩ হিঃ

ঘর এক সম্পদ

আল্লাহ জাল্লা শানুহ মানুষের জন্য গৃহকে আবাস স্থল করেছেন। (সূরা আন-নাহল ৬ : ৮০)

তিনি তাঁর সম্পদ বান্দার উপর পরিপূর্ণ করার জন্য গৃহ ও গৃহনির্মাণের বিভিন্ন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ গৃহ নির্মাণ করে। সামর্থ্য ও মনমত সে গৃহকে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করে নেয়। যে গৃহ তার মাথা গোঁজার ঠাঁই, আশ্রয় স্থল, আত্মরক্ষার স্থান, ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্র এবং আরো বহু কল্যাণ সাধনের জায়গা।

ঘর মানুষের পান, ভোজন, শয়ন ও বিশ্রামাগার, দেহ ও মনের আনন্দনিকেতন, নির্জনতাবলম্বন ও স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগের আবাস; পরিবার ও পরিজনের সাথে একত্রে সুখ ভোগ করার বাসস্থান।

গৃহ নারীর জন্য সতীত্ব ও নারীত্ব রক্ষার পর্দা ও নিবাস। জাহেলিয়াতের যুগের মত নগ্নতার সাথে নিজেকে প্রদর্শন করে না বেড়িয়ে নারী এ গৃহে আত্মগোপন করে। (সূরা আর-রূম ৩০ : ৩৩)

এ ধরণীতে যারা গৃহহীন; যাদের দেহকে শীত ও তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাঁই বলতে নেই, যারা এ বিশ্ববালাখানার আসমানী ছাদের নীচে মাটির বিছানায় শয়ন করে কালাতিপাত করে, যারা ফুটপাতে, সাময়িক শরণার্থী শিবিরে, স্টেশন ও প্রতিক্ষালয়ে জীবনাতিবাহিত করে তাদের প্রতি লক্ষ্য করলে অতি সহজে গৃহের কদর ও মান নির্ণয় করা যায়। গৃহহারা অবস্থায় মানুষের অবস্থা দর্শন করলে ঘর কত বড় সম্পদ তা অনুমেয় করা যায়।

আল্লাহ জাল্লাত কুদরাতুহ যখন বানু নাযীর ইহুদী-গোষ্ঠির নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন তখন তাদেরকে এই সম্পদ হতে বঞ্চিত করলেন এবং তাদের গৃহাদি ধ্বংস করে তাদেরকে নির্বাসিত করলেন। (সূরা আল-হাশর ৫৯ : ২)

পরিবার ও পরিবেশ সম্পর্কে মুসলিমের সযত্নতার কারণ

বাড়ির পরিবার ও পরিবেশ সম্পর্কে মুসলিম বড় সযত্ন ও সচেতনশীল হয়। তাই পরিবার যাতে আদর্শবান হয় এবং পরিবেশ যাতে সুন্দর ও নির্মল হয় তার সবিশেষ প্রচেষ্টা করে থাকে। যেমন ঃ-

১- এই প্রচেষ্টায় সে নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে নরকাগ্নি হতে রক্ষা এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে উদ্ধার করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মমহৃদয় কঠোরস্বভাব ফিরিশতাগণের উপর। যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। (সূরা আত্তাহরীম (৬৬) : ৬)

২- পরিবার ও পরিবেশের বৃহৎ দায়িত্ব ও গুরুভার রয়েছে মুসলিমের উপর। যার প্রসঙ্গে তাকে বিচার দিবসে কিয়ামতে প্রশ্ন ও কৈফিয়ত করা হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রক্ষককে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে এবং প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবককে তার তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যথার্থই কি তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে, অথবা অবহেলা হেতু তা বিনষ্ট করেছে?" (নাসাঈ, সহীহুল জামে' ১৭১৭৫ নং)

৩- ঘরই আত্মরক্ষার স্থান, বিভিন্ন মন্দ ও দুষ্কর্ম হতে নিরাপত্তার স্থল এবং বিশেষতঃ ফিতনার সময় নির্লিপ্ত হয়ে নিজেকে নিরাপদে রাখার শরয়ী জায়গা।[1] আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "সুসংবাদ তার জন্য যে তার নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে আর (যখন কারো বিরুদ্ধে কিছু বলা বা প্রতিবাদ করার ফল অধিক মন্দ হয় তখন) গৃহে অবস্থান করে এবং নিজ কৃতপাপের উপর রোদন করে।" (সঃ জামে' ৩৮২৪)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি পাঁচটির একটি পালন করবে সে আল্লাহর উপর যামিন হয়ে যাবে; কোন রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করে তার অবস্থা জানবে, অথবা জিহাদে প্রস্থান করবে, কিংবা তার ইমাম বা নেতার নিকট তার শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে, অথবা (প্রকাশ্য কুফরী শুরু না হলে ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ ঘোষণা না করে) স্বগৃহে উপবেশন করবে যাতে তার বাক্‌শক্তি ও অন্যান্য শক্তি হতে জনগণ এবং জনগণের বিভিন্ন অত্যাচার হতে সে নিরাপদে থাকবে।" (মুসনাদ আহমাদ ৫/২৪১)

তিনি আরো বলেন, "ফিতনার সময় মানুষের নিরাপত্তার উপায় তার স্বগৃহে অবস্থান।" (সহীহুল জামে' ৩৫৪৩নং)

সমাজ যখন গভীর পাপ বন্যায় নিমজ্জিত হয়; পথে সর্বদা পাপই দৃষ্ট হয় অর্ধনগ্ন বা উলঙ্গ নারী, ব্যভিচারিণীর আহ্বান-ইঙ্গিত, গান-বাজনা ও মদ্য-জুয়ার আসর, ধর্মবিরোধী এবং ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গকারী মজলিস যখন পথে-ঘাটে-মাঠে জমে উঠে এবং মুসলিম যেখানে নিঃসঙ্গ ও একা হয়, আর এসব গর্হিত নিন্দনীয় কাজে সে বাধা দিতে সক্ষম হয় না সেখানে তার জন্য আপন গৃহই নিরাপদ স্থান। তখন সে গৃহে অবস্থান করে নিজের আত্মা রক্ষা করে, হারাম করা ও দেখা হতে নিজেকে হিফাযতে রাখে। তখন সে নিজের স্ত্রী-কন্যাকে নগ্নতা ও অবাধ মিলামিশা হতে বাঁচায় এবং তার সন্তান-সন্ততিকে অসৎসংসর্গ হতে রক্ষা করে।

[1] ফিতনা এমন গৃহযুদ্ধকে বলে যাতে ন্যায়-অন্যায় এবং সত্যানুসারী-মিথ্যানুসারী নির্ধারণ সহজ নয়।

৪- মানুষ সাধারণতঃ অধিকাংশ সময় তার গৃহাভ্যন্তরে কাটায়। বিশেষতঃ প্রচণ্ড শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষার সময়, দিবসের প্রথম ও শেষ ভাগে এবং কর্ম বা অধ্যয়ন হতে অবকাশকালে। এই সময় অবকাশ বা ফুরসৎকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে ব্যবহার করা মুসলিমের জন্য একান্ত জরুরী। নচেৎ তা অবাধ্যতা ও পাপকর্মে বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অধিক থাকে।

৫- পরিবার ও পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাড়ির প্রতি যত্নবান ও সচেতন হওয়াই প্রকৃত ইসলামী পরিবেশ ও সমাজ গঠনের বড় মাধ্যম ও শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

কারণ, সমাজ কয়েকটি ঘর মিলে গঠিত; যে কয়েকটি ঘর-বাড়ি হয় সমাজের ইষ্টকপ্রস্তর। আর তা নিয়ে গ্রাম ও নগর তৈরী হয়। এই গ্রাম ও নগরই হল সমাজ।

অতএব ঘরের ইঁট-পাথর যদি মজবুত হয় তবে সমাজের সৌধ ও মহল শক্ত হবে।

আল্লাহর অনুশাসন মানতে ও মানাতে এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে দৃঢ়পদ হবে।

সমাজে শুধু কল্যাণ ও কল্যাণই দৃষ্ট হবে। অকল্যাণ ও অন্যায় সমাজে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।

তখন মুসলিমের গৃহ হতে তৈরী হবে সমাজ সংস্কারক বীর পুরুষ, আদর্শ সত্যানুসারী নেতা, ছাত্র ও যোদ্ধা, আদর্শময়ী সতী স্ত্রী, সুসন্তান পালনকারিণী মা এবং আরো বহু সুশৃঙ্খল স্থাপনকারী ও মঙ্গল সাধনকারী নর-নারী। তাই তো পরিবার এমন এক প্রতিষ্ঠান ও কারখানা যাতে ঈমানী যত্নে আদর্শ মানব-রত্ন তৈরী হয়।

মানব সভ্যতার মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ইসলামী কারখানার প্রত্যেক সদস্য বা কর্মচারীই এটাই কামনা করে যে, তার কারখানায় তৈরী প্রত্যেক ভাবী উত্তরসূরি তার চেয়েও অধিকতর উন্নত ও উপযুক্ত হোক।

অতএব বিষয় যখন এত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের গৃহ ও পরিবেশে এত অশ্লীলতা, নোংরামী, গর্হিতাচরণ পরিদৃষ্ট; পরন্তু গৃহকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এ মর্মে বড় অবজ্ঞা, অবহেলা ও হেলা-ফেলা দেখা যায় তখন প্রশ্ন আসে যে, গৃহ, পরিবার ও পরিবেশকে সৎ, সুন্দর ও নির্মল করার মাধ্যম ও উপায় কি? পরবর্তী আলোচনায় আমরা সেই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। আল্লাহ যেন সেই উত্তরের মাঝে মুসলিমকে এবং তার ঘর, পরিবার, পরিবেশ ও সমাজকে শুদ্ধভাবে গড়ে তোলার তওফীক ও প্রয়াস দান করেন। আমীন।

গৃহের আধ্যাত্মিক গঠন-প্রণালী

সহধর্মিণী সুনির্বাচন

আদর্শ গৃহ গড়ার প্রথম সোপান হল, এ গৃহের জন্য আদর্শময়ী সতী স্ত্রী সুনির্বাচন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আন-নূর (২৪) : ৩২)

গৃহস্বামীর উচিত পূণ্যময়ী সতী নারীকে নিম্নবর্ণিত আলোকে স্ত্রীরূপে নির্বাচন করা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নারীকে চার বস্তুর কারণে বিবাহ করা হয়। তার সম্পদ, বংশ, রূপ ও ধর্মের কারণে। তুমি ধর্মপ্রাণাকে প্রাধান্য দাও, তোমার হস্তদ্বয় ধূলী-ধূসরিত হোক। " (বুখারী ৯/১৩২, মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, "দুনিয়ার সবটাই ভোগবিলাসের উপকরণ এবং দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হল সাধ্বী স্ত্রী।" (মুসলিম, নাসাঈ)

তিনি অন্যত্র বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিক্‌রকারী জিহ্বা এবং এমন মুমিনা (বিশ্বাসী) স্ত্রী হওয়া উচিত, যে তাকে আখেরাতের ব্যাপারে সহায়তা করে।" (মুসনাদ আহমাদ ৫/২৮২, তিঃ)

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, "এমন সতী স্ত্রী বরণ করা উচিত, যে তোমাকে তোমার দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে সাহায্য করে; যা সকল সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (সহীহুল জামে ৪২৮৫নং)

"প্রণয়িনী ও অধিক সন্তানপ্রসূ নারীকে বিবাহ কর । কিয়ামতে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে সকল আম্বিয়ার নিকট আমি গর্ব করব।" (মুসনাদ আহমাদ ৩/২৪৫, প্রমুখ)

"তোমরা কুমারী বিবাহ কর, কারণ, কুমারী গর্ভাশয়ে অধিক সন্তানদাত্রী, জ্ঞাতিবন্ধনে প্রীতিপ্রদা, মুখে মধুরা, স্বল্পে সন্তুষ্ট এবং প্রবঞ্চনা ও ছলনায় খুব কম হয়।" (ইবনে মাজাহ ১৮৬১নং)

সতী ও সাধ্বী পত্নী যেমন পুরুষের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় তেমনি অসতী পত্নী তার পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সতী স্ত্রী এক সৌভাগ্যের সম্পদ; যাকে তুমি দেখে পছন্দ কর এবং যে তোমার মন মুগ্ধ করে, আর তোমার অবর্তমানে তার ব্যাপারে ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে সুনিশ্চিত থাক।

পক্ষান্তরে (অসতী) স্ত্রী দুর্ভাগ্যের আপদ; যাকে দেখে তুমি অপছন্দ কর এবং যে তোমার মন মুগ্ধ করতে পারে না। যে তোমার উপর মুখের হামলা চালায়। আর তোমার অনুপস্থিতিতে তার ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পার না।" (সিলসিলা সহীহাহ ১৮২নং, ইবনে হিব্বান)

অপর দিকে কোন নারীকে বিবাহের পয়গাম দেওয়ার পূর্বে তার সম্পর্কে অধিক যাচাই ও বিচার করা এবং বিশেষভাবে পরখ করা ও দেখা অতি প্রয়োজন। কিন্তু এই পরখের সময় তার বিষয় ও কষ্টিপাথর হবে কেবলমাত্র দ্বীন ও চরিত্র-গুণ। রূপলাবণ্য, বংশমর্যাদা ও সম্পদ উদ্দেশ্য যেন না হয়। অবশ্য এ চারের সমষ্টি নারী হলে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু কিছু না পেয়ে কেবলমাত্র দ্বীন পেলে সেরূপ নারীকে গ্রহণ করে মুসলিম সুখী হয়। অন্যথায় তার সোনার সংসারে সুখের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, তার সাথে (তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর (শুধুমাত্র দ্বীন ও চরিত্র দেখে তাদের বিবাহ না দাও বরং দ্বীন বা চরিত্র থাকলেও কেবলমাত্র বংশ, রূপ বা ধন-সম্পত্তির লোভে বিবাহ দাও) তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও মস্ত ফাসাদ, বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।" (ইবনে মাজাহ ১৯৬৭নং)

অনুরূপভাবে দ্বীন তথা রূপ ও বংশমর্যাদাকে গৌণ ভেবে পণ ও যৌতুককে মূখ্য উদ্দেশ্য করে তাদের ও সংসারের মাঝে যে অশান্তির ঝড় আসে তা বলাই বাহুল্য।

এরূপ মিষ্টি জুলুম যে শরীয়ত-পরিপন্থী এবং দাম্পত্য সুখে কণ্টক স্বরূপ তা অনুমেয়। পরন্তু পণ ও যৌতুকের লোভে বধূনির্যাতন ও বধূহত্যার সংখ্যা যে বেড়ে চলছে এবং কত পুরুষের সোনার প্রেমমহল যে ভেঙে চুরমার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সুখের বাসা দুঃখের ইঁটে, কেমনে হবে সুখ? মুসলিমের উচিত, কুরআনী বিধানে (মোহর নিয়ে নয়, বরং মোহর দিয়ে) দ্বীনদার মহিলা বিবাহ করা। এতে তার অন্য কিছু লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত, শুধু গুণবতী, সতী ও ধার্মিক নারী। যাতে দাম্পত্য সুখময় হয়, মধুময় হয় সোনার সংসার।

সৎপুরুষ এবং সতী নারী মিলে গঠন করে সুগৃহ, সৎ পরিবার ও সুন্দর পরিবেশ।

যেহেতু উৎকৃষ্ট ভূমিতে প্রতিপালক আল্লাহর আদেশে ফসল উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে আগাছা জঞ্জাল ব্যতীত কিছুই জন্মায় না।

স্ত্রীর চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টা

স্ত্রী যদি আশার বিপরীত হয়েই যায় তবে গৃহস্বামীর অবশ্য কর্তব্য, তার চরিত্র সংশোধন করা, ধর্মের প্রতি তার গতি প্রত্যাবর্তন করা এবং যথাসম্ভব তাকে সৎপথে আনার প্রচেষ্টা করা।

এরূপ প্রয়োজন তখন হয়ে থাকে যখন পুরুষ কোন অধার্মিকা নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে। হয়তো বা প্রথম দিকে ধর্মের প্রতি তার প্রণিধান না থাকার কারণে, অথবা তাকে এই আশায় বিবাহ করে যে, সে পরে ভালো হবে কিংবা সে তাকে সংশোধিতা করতে পারবে। অথবা অভিভাবক কিংবা অন্য কোন কিছুর চাপে পড়ে তাকে বিবাহ করে থাকে, সে ক্ষেত্রে তাকে শুধ্‌রে নেওয়ার ঘোর প্রচেষ্টা করা একান্ত জরুরী হবে।

তবে একথা জানা জরুরী যে, হেদায়াত বা সুপথে আনার কাজ আল্লাহর। তিনিই কাউকে চাইলে সুপথে আনেন, শুধ্‌রে দেন। যেমন তিনি তাঁর প্রিয় বান্দা নবী যাকারিয়া عليه السلام-কে এই অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেন,

{وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ}

“এবং আমি তার স্ত্রীকে সংশোধন করলাম।” (সূরা আল-আম্বিয়া (২১) : ৯০)

চাহে এ সংশোধন দৈহিক হোক অথবা চারিত্রিক। ইবনে আব্বাস عليه السلام বলেন, ‘তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলাতাঁর বন্ধ্যত্ব দূর করেছিলেন।’ আতা (রঃ) বলেন, ‘তাঁর জিহ্বায় কঠোরতা ছিল, আল্লাহ তা সংশোধন করেছিলেন।’ (তাফসীর ইবনে কাসীর ৫/৩৬৪)

স্ত্রীর চরিত্র সংশোধন করার বিভিন্ন মাধ্যম ও উপায় রয়েছে ঃ-

১। স্ত্রীর মাঝে কোন প্রকারের নোংরামীর ছায়া থাকলে তা শাসন ও সোহাগের আলো দ্বারা দূরীভূত করা এবং যাতে সেই নোংরামী পুনরায় তাকে স্পর্শ না করতে পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসতী, বদস্বভাব ও ভ্রষ্ট প্রকৃতির সঙ্গিনী, সখী ও বান্ধবী থেকে তাকে দূরে রাখা। চেহারা দেখানো জায়েযের ফতোয়া নিয়ে নিজের অথবা তার বন্ধু, চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাই ইত্যাদির সহিৎ অবাধ মিলামিশা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, হাসাহাসি, তদনুরূপ দেওর, ভগিনীপতি ও নন্দাইদের সাথে অবাধ মিলামিশা ও হাসি-তামাসা বা কোথাও আসা-যাওয়া করতে সুযোগ না দেওয়া।

২। তার সাথে কোন সতী ও পুণ্যময়ী নারীর সখ্যতা স্থাপন করা। যাদের সাক্ষাতে সে ভালো কথা ও কাজ বলতে ও করতে উৎসাহিতা হতে পারে।

৩। এমন স্থানে যেতে না দেওয়া যেখানে চরিত্র বিগড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে যেমন নাটক-যাত্রা, টিভি, ভিডিও, সিনেমা (সাধারণতঃ এ সবে নোংরামি ও অশ্লীলতা প্রচার হয় বলে) থিয়েটার, মেলা ইত্যাদি।

৪। এমন জায়গায় তার ভ্রমণ হওয়া উচিত, যেখানে সে জ্ঞানার্জন ও ইসলামী পরিবেশ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে পারে এবং নিজেকে কোন আমলে একাকিনী না মনে করে।

৫। অবিরাম সদুপদেশ দেওয়া। ফল না হলে তার শয্যা ত্যাগ করা। আর তাতেও ফল না হলে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক প্রহার করা। (সূরা আন-নিসা (৪) : ৩৪)

৬। লাভদায়ক ইসলামী ক্যাসেট শুনতে দেওয়া। বিভিন্ন ওলামার জ্ঞান গর্ভ ঈমানী বক্তৃতা কাস্যেট করে তাকে শুনানো।

৭। ফলদায়ক ইসলামী বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে দেওয়া।

৮। দান-সাদকাহ ও অন্যান্য পুণ্য কাজের উপর উৎসাহ দান করা।

৯। কুরআন মাজীদ নিয়মিত পাঠ করার আদেশ দেওয়া।

১০। বিভিন্ন দুআ-দরূদ শিখিয়ে যথা সময়ে স্মরণ করিয়ে পড়তে বলা।

১১। তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করে তার ঈমান বাড়াতে সাহায্য করা।

১২। সর্বপ্রকার আল্লাহর ইবাদত বিশুদ্ধভাবে আদায় করার উপর তাকে সহায়তা করতে যত্নবান হওয়া।

ঘরকে আল্লাহর যিক্‌রের স্থল বানানো

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র করা হয় না, উভয়ের উপমা জীবিত ও মৃতের মত।” (মুসলিম)

অতএব ঘরকে জীবন্ত রাখতে হলে তাতে যাবতীয় যিক্‌রের জীবন দান করতে হবে। অন্তর ও রসনার যিক্‌র, নামায ও কুরআন তেলাঅত, কিংবা শরীয়তের ইল্‌মী মহফিল ও ইসলামী বই-পুস্তক পঠনের মাধ্যমে গৃহের দেহে আত্মাপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, অধিকাংশ মুসলিমদের বাড়ি আজ মৃত। যাতে আল্লাহর কোন যিক্‌র তো হয়ই না; বরং উল্টা তাতে শয়তানের যিক্‌র হয়। গান-বাজনা, (টিভিতে) অশ্লীল ছবি, নোংরা পত্র-পত্রিকা, গীবত-চুগলী, মিথ্যা কথা, কলঙ্ক, অপবাদ ইত্যাদিতে সরগরম থাকে সে ঘর। পাপরাশি ও গর্হিত ক্রিয়াকাণ্ডে ভরপুর জমজমাট থাকে। আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীর নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা হয়।

যে ঘরে প্রবেশ করতে কোন বাধা-বিঘ্ন নেই। কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না বরং সে ঘর সকলের জন্য থাকে খোলা-মেলা। বহু গৃহস্বামিনী আবার ‘সরকারী ভাবী’ রূপে পরিচিতা। কোনও পুরুষের সাথে সাক্ষাতে যার কোন বাধা থাকে না।

মনে রাখার কথা যে, ইসলামে পুরুষের নিকট তার নিজ ভাবী ও বউসীন, শালী, শালাজ ও জেঠশাশ (স্ত্রীর বড় বোন), নারীর নিকট তার ভগিনীপতি বা বুনুই ও জামাই (তার ছোট বোনের স্বামী), দেওর, ভাশুর ও নন্দাই সকলেই সমান। কেউ লাজ কাটার ও শ্রদ্ধার পাত্র এবং কেউ রসিকতা ও হাসি-তামাসার পাত্র নয়। সকলের সাথে সময়ে বিবাহ বৈধ। তাই সকল হতে পর্দা ফরয।

যে ঘরে উল্লেখিত রসিকতার পাত্র-পাত্রীদের উল্লেখযোগ্য রসকথা চলে, যে ঘরে সদা পাপ ঢোকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা কি করে প্রবেশ করবে? সুতরাং গৃহকর্তার উচিত, সে যেন নিজ গৃহকে নেকীর আস্তানা বানায়, বদীর আড্ডাখানা নয়। ঘরকে যেন আল্লাহর যিক্‌র ও আনুগত্যে সদাজাগ্রত ও জীবিত রাখে।

ঘরকে কেবলা বানানো

গৃহস্বামীর উচিত, সে তার ঘরকে যেন কেবলা বানায়। অর্থাৎ তা ইবাদতগাহ বানায়; যাতে সর্বদা তাতে আল্লাহর ইবাদত হয়। আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল বলেন,

{وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}

“আমি মূসা ও তাঁর ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করলাম যে, মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর এবং তোমাদের গৃহগুলিকে কেবলা (উপাসনাগৃহ) কর, নামায পড়, আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও।” (কুঃ ১০/৮৭)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ‘তাঁরা গৃহকে মসজিদ করবার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।’ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, ‘এই আদেশ এই জন্য ছিল যে, ---আর আল্লাহই অধিক জানেন---যখন ফিরআউন ও তার গোষ্ঠীর তরফ হতে তাঁদের উপর কষ্ট ও নিপীড়ন বেশী হতে লাগল এবং তারা তাঁদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তখন তাঁরা অধিক নামায পড়তে আদিষ্ট হলেন। (যার দরুন মসজিদে ও ঘরে বেশী বেশী করে নামায আদায় করতেন।) যেমন আল্লাহ তা'আলাবলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ}

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” (সূরা আল-বাক্বারা (২) :১৫৩)

আর রসূল ﷺ যখন কোন সঙ্কটে পড়তেন তখন নামায শুরু করতেন। (তঃইঃ কাঃ ৪/২২৪)

অতএব এখান থেকে গৃহাভ্যন্তরে ইবাদত করার গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়; বিশেষ করে কোন বিপদ ও সঙ্কটের মুহূর্তে। অনুরূপভাবে এমন পরিস্থিতিতেও ঘরে নামায আদায় করা হয় যখন কাফেরদের ভয়ে বাইরে মসজিদে পড়তে পারা যায় না।

যেমন, নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম।

আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, “ফরয নামায ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামায হল তার ঘরে পড়া নামায।” (আবূ দাউদ, নাসাঈ, প্রমুখ, সহীহুল জামে ১১১৭নং)

“তোমাদের কিছু (নফল) নামায ঘরে পড়। আর ঘরকে কবর বানিয়ে দিও না।” (মুসনাদ আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে ১৫৪ নং)

“তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) নামায সম্পন্ন করবে, তখন সে যেন কিছু (নফল) নামায স্বগৃহে পড়ে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তার এ (স্বগৃহের) নামাযে মঙ্গল নিহিত রেখেছেন।” (মুসনাদ আহমাদ, মুসলিম ৭৭৮ নং)

এই অবসরে হযরত মারয়্যামের মিহরাবের কথা স্মরণে আসে। যা তাঁর আরাধনাস্থল ছিল। যাঁর কথা আল্লাহ তাঁর কুরআন মাজীদে বলেন, “যখনই যাকারিয়া মিহরাবে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত।” (সূরা আলু ইমরান ৩ : ৩৭)

অনুরূপ সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) গণও বাড়িতে (নফল) নামায পড়ায় আগ্রহী ছিলেন।

মোটকথা গৃহস্বামী যদি কিছু নফল নামায বাড়িতে পড়ে, তবে তার পরিবার-পরিজন তা দেখে সেই পরিবেশ তৈরী করতে অভিলাষী ও উদ্বুদ্ধ হয়। (প্রকাশ যে, অকারণে ফরয নামাযে মসজিদের জামাআত ত্যাগ করলে পাপী হতে হয়।)

পরিবারের জন্য ঈমানী তরবিয়ত

অনেক গৃহকর্তা এমন আছে, যে বাইরে তালীম দেয় কিন্তু বাড়িতে তার মুখ চলে না অথবা খুলে না। বাইরে যা শুনে আসে তা নিজের জন্যই যথেষ্ট মনে করে। আর পরিবারকে তা শোনাবার প্রয়োজনই মনে করে না। জুমআর খুৎবায় বা জলসামহফিলে শুনে শুনে প্রায় সে ‘হাফ আলেম’ হয়ে যায়, কিন্তু বাড়িতে কিছু ব্যক্ত না করার জন্য মহিলারা ‘ফুল জাহেল’ থেকে যায়। অথচ তাদেরকেও শিক্ষা দেওয়া তার বড় কর্তব্য। নিজের মুখে অথবা ক্যাসেটাদির মাধ্যমে পরিবারকে ঈমানী তরবিয়ত দেওয়া মুসলিমের উচিত। টেপ রেকোর্ডারকে তরবিয়তি কাজে ব্যবহার না করে, ছায়া-ছবি বা হিন্দি গান[2] ইত্যাদিতে ব্যবহার করা অবশ্যই সর্বনাশের পথ।

যেমন রেডিও ও টিভি খবরের নামে ঘরে রেখে যদি গান-বাজনা এবং নগ্ন ও অশ্লীল ছবি দেখা-শোনা হয়, তবে কর্তাকে সে বিষয়ে সতর্ক হয়ে যাতে হারাম কাজে অযথা সময় নষ্ট না হয় এবং ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনায় ও চারিত্রিক ক্ষতি না হয়---তার জন্য সচেষ্ট ও যত্নবান হতে হবে।

হাতে-কলমে ইসলামী তা'লীম, কথায় কথায় সদুপদেশ এবং বিশেষ হিকমতের সাথে তরবিয়ত দান করলে বাড়ির পরিবারের মধ্যে সচেতনতা ফিরে আসবে।

ভাবতে অবাক লাগে ও যা অত্যুক্তি নয় যে, সউদী আরবের (আল-মাজমায়) এক বাড়ির মহিলা গেটে (এদের পুরুষ গেট ভিন্ন থাকে) একজন চার বছরের ছেলে ও

[2] গান; অসার, অশ্লীল ও কাম লালসাপূর্ণ বাক্য দ্বারা গঠিত কণ্ঠ সঙ্গীতকে বলা হয়; যদিও বা তাতে বাদ্য না হয়। আল্লাহ তাআলা এর হারাম ও অবৈধতার প্রতি আলকুরআনে (৩১/৬) ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু যা বাদ্যযন্ত্রের সাথে গাওয়া হয় তা শ্লীল ও জ্ঞানগর্ভ হলেও হারাম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “অবশ্যই আমার উম্মতের এমন কতক গোষ্ঠী হবে যারা ব্যভিচার ও (পুরুষের জন্য) রেশমী কাপড়, মাদকদ্রব্য ও বাদ্যযন্ত্রকে (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে। (বুখারী) অশ্লীল গানে মুমিনের জন্য কোন হিতকর জ্ঞান নেই। কেউ কেউ বলে, ‘গানে জ্ঞান বাড়ে, গান রূহের খোরাক।’ কিন্তু সলফগণ বলেন, ‘গান মনে নিফাক (কপটতা) উদ্‌গত করে, গান ব্যভিচারের মন্ত্র।’ সুতরাং গান সত্যপক্ষে যে জ্ঞান বাড়ায় তা হল, অবৈধ ভালোবাসা ও ব্যভিচারের জ্ঞান। আর অভিজ্ঞতাই তার সাক্ষী।

একজন ছয় বছরের মেয়ে দুই ভাই-বোনে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় তাদের সম্মুখ পথে আমি অতিক্রম করছিলাম। কানে এল, ছেলেটি মেয়েটিকে শশব্যস্ত হয়ে বলছে, 'উদখুলী, রাজ্জাল জায়ি, উদখুলি রাজ্জাল জায়ি।' অর্থাৎ ঘরে ঢোক লোক আসছে। সেদিন আমি বড় অবাক হয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম যে, এটা কেবল তরবিয়ত ও পরিবেশেরই ফল।

অনুরূপভাবে যে শিশু কন্যাকে শিশু অবস্থা হতেই পায়জামা ও মাথায় উড়না পরানো হয় এবং তার মাথা খুললেই অথবা গাঁটের কাপড় উপরে উঠলেই 'ছিঃ ছিঃ' করা হয় সে কন্যা বড় হয়ে মাথার কাপড় খুলতে ও পায়ের কাপড় তুলতে বা হাফ ফ্রক পরতে লজ্জা করবে। অন্যদিকে ছোট থেকে টাইট্‌ফিট পোশাক অভ্যস্ত করালে বড় হয়েও তাই পরতে চাইবে এবং ঢিলা পোশাক দেখলে তাকে হাসি পাবে। কারো মাথায় কাপড় দেখলে অথবা গায়ে চাদর বা বোরকা দেখলে তাকে (মানসিক) গরম লাগবে। মানুষ তো অভ্যাসের দাস। আবার কচিকাঁচা শিশুরা তো (বিশেষ করে পিতা-মাতার) অনুকরণ প্রিয়। পিতা-মাতা যেমন পরিবেশ গড়বে সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা সেই পরিবেশকেই উত্তম এবং অন্য পরিবেশকে অধম মনে করবে। (অবশ্য বড় হয়ে তারা নিজের জ্ঞান খাটালে সঠিক কি তা অবশ্যই বুঝতে পারবে।) তাই গৃহকর্তার উচিত, পরিবারের জন্য সঙ্গত পরিবেশ রচনা করা। কথায় কথায় ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দ চিহ্নিত করা। এ বিষয়ে তার আদৌ গয়ংগচ্ছ করা সমীচীন নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। যখন তিনি বিতর পড়ে নিতেন তখন (স্ত্রী) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জাগিয়ে বলতেন, 'উঠ, বিত্‌র পড় আয়েশা।' (মুসলিম ৬/২৩)

তিনি বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর করুণা করেন, যে ব্যক্তি রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও নামাযের জন্য জাগরিত করে। যদি সে অমান্য করে (ঘুমের ঘোরে উঠতে না চায়), তবে তার মুখে পানির ছিটা দেয় (এবং তাকে জাগিয়ে তোলে)। (মুঃআঃ, আদাঃ)

বাড়িতে মেয়েদেরকে দান-খয়রাত করায় উদ্দীপনা দেওয়াও ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার কারণ; যা এক মহত্ত্বপূর্ণ বিষয় এবং যাতে সমাজ ও পরিবেশের বিরাট কল্যাণ সাধন হয়ে থাকে। সেই উদারতায় দরিদ্ররাও এ পরিবেশকে পছন্দ করে তার অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। এ বিষয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ওগো নারীর দল, তোমরা সদকা কর, কারণ, আমি তোমাদেরকে (পুরুষ অপেক্ষা) বেশীর ভাগ জাহান্নামে দেখেছি।" (বুঃ ১/৪০৫)

অধুনা কোন কোন পরিবেশে বাড়িতে বাড়িতে রান্না ঘরে যে নির্দিষ্ট ভাঁড় রাখা হয়, যাতে প্রত্যহ রান্নার পূর্বে এক মুষ্টি বা ততোধিক চাল মিসকীনদের জন্য তুলে রাখা হয় অথবা বাড়িতে কোন নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র পেটিকা সদকা ও চাঁদার জন্য রাখা হয় তা মন্দ নয়। বহু বাড়ি থেকে সারা বছর কোন মিসকীন বা মাদ্রাসার কোন আদায়কারী যাচ্ঞা করতে না এলে একমুষ্টি চাল বা একটি টাকাও দান স্বরূপ বের হয় না। কিন্তু এ পদ্ধতি

অবলম্বন করলে প্রতিদিন কিছু না কিছু সদকা করা হয় এবং যথাস্থানে কিঞ্চিদধিক দান করা যায়।

গৃহস্বামী পরিবারের আদর্শ। পরিবারের ছেলে-মেয়ে যখন তাকে শুক্লপক্ষে কয়েকদিন, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার, নবম ও দশম মুহার্রম, নবম যিলহজ্জ এবং মুহার্রাম ও শা'বানের অধিকাংশ দিন রোযা রাখতে দেখবে, তখন স্বাভাবিকভাবে তারাও তার অনুকরণ করার চেষ্টা করবে এবং সৎকার্যে আগ্রহান্বিত হবে। এইভাবে প্রতি আমল পরিবারের সদস্যের মনে মূলীভূত করা সম্ভব হবে।

শয়তান যে মানুষের চিরশত্রু তা সকলেরই জানা। মানুষের ক্ষতি সাধন করতে সর্বদা সুযোগ খোঁজে এই শয়তান। মানুষের বাসগৃহে বাসা বাঁধার চেষ্টা করে। তার খাদ্যসামগ্রীতে অংশী হতেও চায়। আর তখন মানুষের গৃহ হতে বর্কত উঠে যায়।

আর যেখানে শয়তান বাস করে সেখানে রহমত ও মঙ্গল না থেকে অশান্তি ও অমঙ্গল বিরাজ করে। তাই মানুষের পথপ্রদর্শক নবী ﷺ মানুষকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শয়তান হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "মানুষ যখন স্বগৃহে প্রবেশ করে এবং আহারাদি ভক্ষণ করে, তখন আল্লাহর নাম নেয়, তাহলে শয়তান তার সহচরদের সম্বোধন করে বলে, 'এখানে তোদের রাত্রি কাটাবার স্থান নেই এবং নৈশভোজনও নেই।' কিন্তু যদি প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম না নেয়, তাহলে বলে, 'তোরা রাত্রিবাসের স্থান পেলি।' আর খাবার সময়ও যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তাহলে বলে, রাত্রিবাসের স্থান এবং নৈশভোজনও পেলি।" (মুসনাদ আহমাদ ৩/৩৪৬, মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, "যখন মানুষ ঘর হতে বের হয় এবং এই দুআ বলে, 'বিসমিল্লা-হ, তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হ, লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' অর্থাৎ 'আল্লাহর নাম নিয়ে বের হলাম, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত পাপ হতে প্রত্যাবর্তন এবং সৎকার্য বরণ করার (নড়া-সরা করার) কোন শক্তি নেই।' তখন তার জন্য বলা হয়, 'তুমি সুপথ পেলে, (আল্লাহর সাহায্য চাইলে তাই) তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হলেন এবং নিরাপত্তা পেলে।' আর শয়তান তার নিকট হতে দূরে সরে যায়। তখন অপর এক শয়তান তাকে বলে, 'এমন লোকের কাছে তোর উপায় কোথায়? যে (আল্লাহর নাম নিয়ে সুপথ পেয়েছে, (আল্লাহ)তার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং সে নিরাপত্তা পেয়েছে।' (আবূ দাউদ ৫০৯৫, তিরমিযী ৩৪২৬)

তিনি হযরত আনাস (রাঃ)কে সম্বোধন করে বলেন, "বেটা! যখন বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তুমি তোমার পরিবারের উপর সালাম দাও। তোমার উপর এবং তোমার পরিবার-পরিজনের উপর বর্কত হবে।" (তিরমিযী, মিশকাত ৪৬৫২নং)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রসূল ﷺ যখন স্বগৃহে প্রবেশ করতেন, তখন সর্বাগ্রে দাঁতন করতেন।' (মুসলিম)

ঘরে সূরা বাকারার তিলাওয়াত

অনেকে ঘর হতে শয়তান জিন বিতারণের উদ্দেশ্যে (অধিকাংশ শির্কী প্রণালীতে ঃ পেরেক-সিঁদুর দিয়ে বাড়ির চার কোণে মাটির ভাঁড় পুঁতে, বাঁশের ডগায় আয়না টেঙ্গে, বাড়ির দরজায়-জানালায় শির্কী তাবীয চিটিয়ে) ঘর বন্ধ করে থাকে। তাতে বহুক্ষেত্রে জিন প্রস্থানের বদলে আগমন করে সেই ঘরে আড্ডা জমায়। কিন্তু আল্লাহর নবী ﷺ যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা যদি ব্যবহার করা হয়, তবে কোন প্রকারের শয়তান ঘরে টিঁকতে পারে না। সে ঘর পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, "তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিও না (অর্থাৎ কবরে যেমন নামায বা তেলাঅত হয় না তেমনি বিনা নামায ও তেলাঅতে ঘরকেও তার মত করো না; বরং তাতে নামায ও তেলাঅত করতে থাক।) অবশ্যই শয়তান সেই ঘর হতে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়।" (মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহে সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ, যে ঘরে এ সূরা পাঠ করা হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।" (সহীহুল জামে ১১৭০নং)

এ সূরার শেষ দুই আয়াতের মহত্ত্ব বর্ণনায় তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী ও ধরণী সৃষ্টির দুই সহস্রবৎসর পূর্বে এক গ্রন্থ (লওহে মাহফুয) লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের নিকট অবস্থিত। তিনি এ (গ্রন্থ) হতে দুটি আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার দ্বারায় সূরা বাক্বারার সমাপ্তি করেন। যে গৃহে এ আয়াত দুটি তিন দিন পঠিত হবে, শয়তান সে গৃহের নিকটবর্তী হবে না। (মুসনাদ আহমাদ ৪/২৭৪)

পরিবারে শরয়ী ইল্ম

পরিজনকে শিক্ষাদান

পরিজনকে (বিশেষ করে ধর্ম শিক্ষায় এবং ন্যূনপক্ষে যা না জানলে আল্লাহকে চিনতে ও তার সঠিক ইবাদত করতে সক্ষম না হয় এমন বিষয়ে) শিক্ষিত করা গৃহস্বামীর জন্য অপরিহার্য শরয়ী কর্তব্য। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা মুমিন গৃহস্বামীদেরকে সম্বোধন ও সতর্ক করে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে অগ্নি হতে রক্ষা কর; যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণের উপর, যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ

করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।" (সূরা আত-তাহরীম (৬৬) : ৬)

এই আয়াতটি পরিবার-পরিজনকে তা'লীম ও তরবিয়ত দান করার আবশ্যকতার বিষয়ে মূল অধ্যাদেশ। গৃহকর্তার জন্য যা ঔচিত্য সে বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাতাগণ বিভিন্ন উক্তি এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম কাতাদাহ (রঃ) বলেন, 'গৃহস্বামী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ করবে, তাঁর অবাধ্যতা করতে নিষেধ করবে, আল্লাহর অনুশাসন দ্বারা তাদের তত্ত্বাবধান করবে ও তা মান্য করার আদেশ দিবে এবং এ বিষয়ে তাদের সহায়তা করবে। অতএব যখন তাদেরকে কোন পাপ কাজে লিপ্ত দেখবে, তখন শাসন ও তিরস্কার করবে।' (তাফসীর ত্বাবারী ২৮/১৬৬)

ইমাম যাহহাক ও মুকাতেল বলেন, 'মুসলিমের জন্য তার পরিবার-পরিজন ও ক্রীতদাসীদেরকে আল্লাহ তাদের উপর যা ফরয করেছেন এবং অবৈধ ও নিষেধ করেছেন তা শিক্ষা দেওয়া জরুরী।' (তাফসীর ইবনে কাসীর)

আলী (রাঃ) বলেন, 'তাদেরকে শিক্ষা দাও এবং আদব (শিষ্টাচার শিক্ষা) দাও।' ত্বাবারী বলেন, 'অতএব, পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে দ্বীন ও কল্যাণ এবং যে আদব-কায়দা সকলের জন্য জরুরী তা শিক্ষা দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য।' আল্লাহর রসূল ﷺ যেখানে ক্রীতদাসীদেরকে শিক্ষা প্রদান করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন অথচ তারা সর্বদা কর্মক্ষেত্রে আপন প্রভুদের কাছে বাঁধা, পরাধীনতায় যাদের জীবন চলে---সেখানে আমাদের স্বাধীন পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দানের ব্যাপারে আমাদের কি অভিমত হতে পারে? নবী ﷺ বলেন, 'তিন ব্যক্তিবিশেষের জন্য দ্বিগুণ নেকী; (তাদের মধ্যে) একজন ঐ ব্যক্তি যার নিকট ক্রীতদাসী ছিল, সে তাকে আদব দান করেছিল এবং সুন্দর আদব শিখিয়েছিল, তাকে শিক্ষা দান করেছিল এবং উত্তম শিক্ষা দিয়েছিল। অতঃপর তাকে স্বাধীন করে বিবাহ করেছিল, তার জন্য দুটি প্রতিদান।" (বুখারী ১/১৯০)

ইমাম বুখারী (রঃ) এই হাদীসটিকে 'স্ত্রী ও ক্রীতদাসীকে পুরুষের শিক্ষাদান' বাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার আস্কালানী (রঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'হাদীসের সাথে শিক্ষাশীর্ষক বাবের সম্পর্ক এই রূপ; (যেহেতু ইমাম বুখারী ক্রীতদাসীর সাথে স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়ার কথাও জুড়েছেন অথচ হাদীসে স্ত্রীর কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তা অসঙ্গত নয়। কারণ,) ক্রীতদাসীকে শিক্ষা দেওয়ার কথা হাদীসের বচনেই ব্যক্ত হয়েছে এবং স্ত্রীর শিক্ষার কথা (কিয়াসে) অনুমিতিতে ব্যক্তীকৃত হয়েছে। কারণ, আল্লাহর ফারায়েয বা অধ্যাদেশ এবং রসূলের সুন্নত বা আদর্শ স্বাধীনা পত্নীকে শিক্ষা দিতে যত্নবান হওয়ার ব্যাপারটা পরাধীনা ক্রীতদাসীকে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা অধিক গুরুতর। (ফতহুল বারী ১/১৯০)

কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, গৃহস্বামী পরিজনকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। এটাকে মূখ্য বিষয় ভাবা তো দূরের কথা অনেকে গৌণ বিষয়ও ভাবে না

অথবা কোন বিষয়ই মনে করে না। পেট ও সংসার চালাবার জন্য অন্যান্য শিক্ষার তাকীদ হয়। মেয়ের বিবাহের সময় বরপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ডিগ্রি লাভ করতে মেয়েকে উৎসাহিতা করতে সচেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষার ব্যাপারে কাউকে ততটা মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। কারণ, 'কানা বেগুনের ডোগলা খদ্দেরও আছে।' বরপক্ষ সাধারণতঃ অধিক পণেই খুশী। তার উপর বাংলা পড়াটা হলে ভালোই বটে। ধর্মীয় কোন বিষয় না-ই বা জানল। কিন্তু গৃহস্বামীকে এ কথা বুঝা উচিত যে, অন্যান্য শিক্ষা না শিখলে পেট বা সংসার চলবে না ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা না শিখলে যে দুনিয়া চলবে না। আল্লাহকে না চিনলে, তাঁর সঠিক ইবাদত করতে না পারলে যে দুনিয়া প্রতিষ্ঠা হলেও আখেরাত ধ্বংস হবে।

গৃহকর্তার অধিক কর্মব্যস্ততা, চাকুরী ও অন্যান্য ব্যাপৃতিতে অবকাশ না থাকার ফলে অনেক সময় পরিবারকে শিক্ষা দিতে মনোযোগী হতে পারে না। আবার এমন কোন প্রতিষ্ঠান ও সুযোগও পায় না, যেখানে মহিলারা নিরাপদে আদবের সাথে উপস্থিত হয়ে দ্বীন শিক্ষা করে।

অবশ্য এই সমস্যার কয়েকটি সমাধান হতে পারে। পরিবার-পরিজনের জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করা, যাতে সকলকে জমায়েত করে ইল্‌মী মজলিস নিয়মিত অনুষ্ঠিত করা হয় এবং সকলকে এ দিন ও সময় সম্পর্কে বিদিত করে যথা সময়ে উপস্থিতির উপর তাকীদ দেওয়া। যাতে তারা সোৎসাহে হাযির হয়ে দ্বীন শিক্ষা করতে পারে। যেমন পরিবেশ ও সমাজ-কল্যাণ বিজ্ঞানী রসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নিমিত্তে এরূপ করতেন। একদা মহিলারা তাঁর নিকট আবেদন করল, 'পুরুষরাই আপনাকে ঘিরে থাকে। তারা সব কিছু শিখতে পারে অথচ আমরা কিছুই জানতে পারি না। অতএব আমাদের জন্য আপনার কিছু সময় ব্যয় করুন এবং একটি দিন আমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট করে আমাদেরকে শিক্ষা দিন।' তিনি তাদের এ আবেদন মঞ্জুর করে একটি দিন নির্দিষ্ট করলেন। যাতে মহিলাদেরকে নির্দিষ্টভাবে আদেশ ও উপদেশ করা হত । (ফতহুল বারী ১/১৯৫)

এ হাদীস হতে গৃহে মহিলাদের তা'লীম দানের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। (যেহেতু স্কুল কলেজে চারিত্রিক শিক্ষা তো বিরল। তা ছাড়া সে সব সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে জল খেতে গিয়ে ঘটিই বেশীর ভাগ হারিয়ে থাকে।) যা এক ফিতনা। এই ফিতনা হতে বাঁচতে গিয়ে অনেকে মেয়েদেরকে জাহেল করে রাখে; স্কুলও পাঠায় না, ঘরেও শিক্ষা দেয় না। আবার যে রোগের ভয়ে স্কুল পাঠায় না সে রোগই অনবধানতার কারণে এবং আত্মসচেতনতা লোপ পাওয়ার ফলে ঘরের ভিতরেই ধরে বসে। ফলে এদিকও যায় এবং ওদিকও। অথচ ইসলামী সমাজে মহিলা শিক্ষক, ডাক্তার ও অন্যান্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন মিটাবার জন্য আত্মসচেতনশীলতা, মহিলা শিক্ষালয় ও মহিলা শিক্ষার অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়-বস্তুর প্রয়োজন; যার সুবন্দোবস্ত বহু ইসলামী রাষ্ট্রেই আছে। কিন্তু যেখানে মুসলিম অনন্যোপায় সেখানে তার কর্তব্য কি? দ্বীন ও দুনিয়ার উপকার ও অপকারকে মানদণ্ডের দুই প্রান্তে রেখে বিচার

করবে। যাতে উপকার আছে তাই অবলম্বন করা জ্ঞানী ও মুসলিমের কর্তব্য এবং ফিতনার কারণ, হেতু ও অসীলা থেকেও নিরাপদ ও সাবধান থাকা উচিত। শরীয়তের নীতি বলে, 'ইষ্টলাভের পূর্বে অনিষ্ট দূর করাই অগ্রগণ্য।' প্লেনে, ট্রেনে প্রভৃতি যানবাহনে দাহ্যপদার্থ বহন করলেই যে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটবে তার কোন মানে নেই। তবুও যেহেতু এর ফলে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে সেহেতু কর্তৃপক্ষ তা বহন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কোন এক পুকুরে জানা গেছে, সেখানে কুমীর আছে। সে পুকুরে নামলেই যে কুমীর সকলকে ধরে নেয় তাও জরুরী নয়। তবুও শোনা গেছে যে, প্রতিবেশীর দু'-একজনকে ধরে হত্যা করে ফেলেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জ্ঞানীর কি উচিত? সে তার ছেলে-মেয়েকে সেখানে সাঁতার কাটতে বাধা দেবে, নাকি উদ্বুদ্ধ করবে? সে যাই হোক না কেন অন্ততঃপক্ষে পর্দা ওয়াজেব হওয়ার কথা তো অস্বীকার ও অমান্য করা মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

উপরোক্ত হাদীস হতে আরো বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামগণের স্ত্রী-কন্যারা শিক্ষার বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, দ্বীন শিক্ষাই মুসলিম জাতির মেরুদণ্ড। দ্বীনই অন্ধকারে চলার পথে হস্তের আলোকবর্তিকা। যাতে ইহকালও উজ্জ্বল হয় এবং পরকালও। কিন্তু অন্ধ আলোর কদর কি জানবে? তার তো দিবারাত্রি উভয়ই সমান। আবার যারা স্বেচ্ছায় দুই চক্ষু বন্ধ করে নেকামীতে আলো না দেখতে চায় অথবা নিদ্রাঘোরে রঙিন স্বপ্নে প্রভাতের আলো না দেখতে পায় তাদেরকে জাগ্রত করবে কে? নেকার নেকামী ও অন্ধের চক্ষুর অপারেশন কে করবে? কে বুঝাবে যে, আসলেই তারা আলোকপ্রাপ্ত নয়।

হ্যাঁ গৃহস্বামী যদি সচেষ্ট হয়, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সে অনুবেদন সম্ভব। কারণ তার জানা উচিত যে, কেবল মাত্র ছেলেদেরকে শিক্ষিত করায় তৎপর হওয়া এবং মেয়েদের শিক্ষার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করা শান্তিময় সমাজ গঠনে মারাত্মক ত্রুটি।

জিজ্ঞাস্য যে, মহিলাদের এ নির্দিষ্ট দিনক্ষণের সভায় কি বিষয় আলোচিত হবে? প্রথমতঃ তাদেরকে মুমিন ও মুসলিমের আকিদা ও বিশ্বাস কি হওয়া উচিত তা (তওহীদ) শিক্ষা দেবে। শির্ক ও বিদআত কি? সমাজে প্রচলিত শির্ক ও বিদআত কি কি তা চিহ্নিত করবে এবং সে সব হতে বাঁচার চেষ্টা করতে তাকীদ দেবে। অতঃপর ইসলামী কর্মাকর্ম যেমন, পবিত্রতা (ওযু গোসল হায়েয-নেফাস) নামায, যাকাত, রোযা, (সামর্থ্যবতী হলে) হজ্জের বিভিন্ন কর্তব্য বিষয়, খাদ্য ও পানীয়র হারামহালাল, পোষাক ও প্রসাধনের বৈধাবৈধ; প্রকৃতিগত আদর্শ (অপ্রয়োজনীয় চুল, নখ ইত্যাদি পরিষ্কার করার বিষয়), পর্দার বিষয়, মাহরাম কে? কাকে দেখা দেওয়া বৈধ ও কাকে তা বৈধ নয়? গান-বাজনা ও ছবি, অশ্লীলতা ও নগ্নতা, সন্তান পালন, স্বামীর বাধ্যাচরণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হবে। এই শিক্ষার সাথে খেয়াল রাখতে হবে যে, তারা যা শিখছে ও জানছে তা কাজে পরিণত করছে কিনা।

এ বিষয়ে যথোপযুক্ত বই-পুস্তক নির্দিষ্ট করে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে এ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

অবশ্য সুযোগমত জালসা মহফিল ও ওয়ায মজলিসে উপস্থিত করে বিভিন্ন ওলামার ঈমানবর্ধক বক্তৃতা শুনিয়েও তরবিয়তী কাজ নেওয়া যায়। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে এ সমস্ত বক্তৃতা ও জুমআর খোতবা ক্যাসেট করে বাড়িতে শুনানোও বড় সহজসাধ্য শিক্ষাদানের উপায়।

এ ব্যাপারে গৃহকর্তার সামর্থ্যানুযায়ী গৃহাভ্যন্তরে একটি ছোটখাট পারিবারিক ইসলামী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। যাতে পরিবারের লোক অবৈধ কিছু খেলায়, শুনায় ও দেখায় সময় নষ্ট না করে এখান হতে কোন বই-পুস্তক পড়ে উপকৃত হতে পারে এবং সম্ভবতঃ নিজে নিজেও কিছু কিছু ধর্মকর্ম, চরিত্র, অধিকার ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর সেই আলোকে সকলেই নিজেকে একজন আদর্শ যুবক বা যুবতী, একজন আদর্শ স্বামী বা স্ত্রী, একজন আদর্শ পিতা বা মাতা হওয়ার উদ্যম ও উৎসাহ অর্জন করতে পারে।

নির্দিষ্ট কোন রুমে স্থাপিত না করে পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত কামরায় যথোচিতভাবে বিশেষ করে শয়নকক্ষে ও বৈঠকখানায় সুবিন্যস্ত করলে সুযোগ ও সুবিধামত অবসর ফাঁকে যে কোন সময়ে পাঠ করা সহজ হবে। তাছাড়া বই হল এমন উৎকৃষ্ট সঙ্গী ও বন্ধু, যে কোন দিন বিচ্ছিন্ন হয় না। এমন আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হয় না। এমন সাথী, যে বহু অসারতা ও অকর্মণ্যতা থেকে রক্ষা করে।

টেপরেকোর্ডার এক ইচ্ছা-শক্তিহীন যন্ত্র। যাকে ভালো-মন্দ উভয়েই ব্যবহার করা যায়। মুসলিম গৃহস্বামীর উচিত, তাকে ভালো কাজে এবং আল্লাহ সন্তুষ্টিতে ব্যবহার করা। বিভিন্ন ক্বারী ওলামা ও ইসলামী বক্তাগণের ক্বিরাআত ও দ্বীনী বক্তৃতা ক্যাসেট করে বাড়িতে রাখলে তা হতে বহু ঈমানী উপকার আশা করা যাবে।

ক্বারীর বিনম্রকণ্ঠে শ্রুতিমধুর ক্বিরাআত পরিবারের মনে বড় প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করলে তো বটেই, তাছাড়া শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ ও স্মৃতিস্থ করতে সহায়ক রূপে মঙ্গল সাধন করবে। আর এতে পরিবারের লোক কুরআনী সুর শ্রবণে অভ্যস্ত হয়ে শয়তানী সুর গান-বাজনা শ্রবণ হতে দূরে থাকবে।

যেহেতু মুসলিমের হৃদয় ও কর্ণে 'কালামুর রহমান' ও 'মিযমারুশ শয়তান'এর সংমিশ্রণ হতে পারে না।

অতএব ক্যাসেটের মাধ্যমে দ্বীনী উপকার অস্বীকার করা যায় না। তবে গৃহকর্তাকে এ কথার বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যে, বক্তৃতা কার এবং বক্তার উদ্দেশ্য কি? নচেৎ অজান্তে ভ্রান্ত মতবাদ ও আকিদা তার গৃহে অনুপ্রবেশ করবে। দ্বীন যাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে, তাদের আকিদা ও অন্যান্য অবস্থার কথা বিচার করতে হবে।

বলা বাহুল্য, যাঁরা সংশুদ্ধি, সংযমশীলতা, তাকওয়া, পরহেযগারী ও ইল্ম অনুযায়ী আমলে পরিচিত এবং যাঁরা সহীহ হাদীসকেই ভিত্তি করে তাঁদের বক্তব্য ও

ফতোয়া পেশ করে থাকেন, যাঁদের নিকট হক ছাড়া কোন প্রকারের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব নেই, যাঁরা দলীল জেনে, মেনে ও দিয়ে কথা বলেন, যাঁরা অতিরঞ্জন ও অবহেলার মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে চলেন, যাঁদের অভিজ্ঞতা ও ইখলাস (ইসলামী সমাজ গঠনে ঐকান্তিকতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা) সর্বজনবিদিত। যাঁদের বক্তব্য ও কর্তব্যের মাঝে মিল আছে কেবল তাঁদেরই ক্যাসেট বাড়িতে রাখা ও শ্রবণ করা দরকার। তাতে দ্বীন ও ঈমানের কোন প্রকারের ভেজালের সংশয় থাকবে না।

ছোট ছোট শিশুদের মিঠা মিঠা ইসলামী কবিতা ও গজল আবৃত্তির ক্যাসেটও মনেপ্রাণে প্রভাব বিস্তার করে এবং অনুরূপ পরিবারের শিশুকে এরূপ ইসলামী শিক্ষায় প্রলুব্ধ করে। তবে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তাতে যেন কোন শির্কী ও বিদআতী ছন্দ না থাকে। যেমন, 'ওগো নবী দয়া করে, পার করিয়া নিও মোরে।' 'সে ফুল যদি না ফুটিত, কিছুই পয়দা না হইত, না করিত আরশ-কুর্সী জলীল রব্বুল' ইত্যাদি।

মুত্তাকীদেরকে গৃহে আমন্ত্রণ

রসূল কারীম ﷺ বলেন, "মুমিন ব্যতীত কারো সঙ্গী হয়ো না এবং তোমার খাদ্য যেন মুত্তাকী ব্যতীত অন্য কেউ খেতে না পায়।" (মুসনাদ আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৫০১৮নং)

গৃহকর্তার উচিত, তার বাড়িতে যেন মুমিন ও মুত্তাকীর নিমন্ত্রণ হয়। কেবলমাত্র মুমিনই যেন তার বন্ধু হয়। যাতে তার সংসর্গে থেকে ঈমানী উপকার লাভ করতে পারে, হযরত নূহ عليه السلام তাই মুমিনদের নিমিত্তে আল্লাহর নিকট দুআ করেছিলেন,

{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً}

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সমস্ত মুমিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা কর। আর জালেম ও সীমালংঘনকারীদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কর। (সূরা নূহ (৭১) : ২৮)

ঈমানদার ও পরহেযগার ব্যক্তির আগমন গৃহে নূর বৃদ্ধি করে। তাঁদের সাথে কথোপকথন, আলোচনা ও আলাপনের মাধ্যমে বহু কল্যাণ লাভ সম্ভব হয়।

আতর-ওয়ালার নিকট বসলে গায়ে আতর লাগিয়ে দেয়, তার নিকট হতে আতর ক্রয় করতে পারা যায় অথবা তার কাছে আতরের সুগন্ধে মন ও মগজ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অনুরূপ গৃহের আবাল-বৃদ্ধ মুত্তাকীর পাশে বসে এবং বনিতারা অন্তরালে বসে ইসলামী তরবিয়ত গ্রহণ করতে পারে। গৃহে ভালো লোকের আসা-যাওয়া হলে মন্দলোক সে গৃহে প্রবেশ করতে অবশ্যই সংকোচ বোধ করে। পরন্তু গৃহকর্তার উচিত, যাতে এমন

কোন লোক তার বাড়িতে আসা যাওয়া না করে যার দ্বারা দ্বীনী, চারিত্রিক বা অন্যান্য কোন প্রকারের ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকে।

বাড়িতে নামায

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলিম নফল নামায বাড়িতেই পড়বে। নবী কারীম ﷺ বলেন, “ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নফল নামায পুরুষের জন্য স্বগৃহেই উত্তম।” (বুখারী)

অতএব কোন শরয়ী ওযর ছাড়া ফরয নামায মসজিদে আদায় করা ওয়াজেব।

তিনি এ বিষয়ে আরো বলেন, “লোকালয়ে পুরুষের নফল নামায অপেক্ষা স্বগৃহে নফল নামায অধিক উত্তম। একাকী ফরয নামায অপেক্ষা জামাআতে ফরয নামায মহত্তর।” (সহীহুল জামে ২৯৫৩)

কিন্তু মহিলার জন্য যত গুপ্ত ও জনহীন স্থান হবে ততই উত্তম। এ ব্যাপারে আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “মহিলাদের উত্তম নামায তাদের কক্ষের অভ্যন্তরে।” (সহীহুল জামে ৩৩১১)

যে ব্যক্তি অন্য বাড়িতে সাক্ষাতের জন্য যায় তার উচিত, সেই বাড়ির গৃহকর্তার ইমামতির স্থানে যেন ইমামতি না করে এবং তার বিনা অনুমতিতে তার আসন বা শয্যায় উপবেশন না করে। (তিরমিযী, সহীহুল জামে ৭৫৮১নং)

গৃহপ্রবেশে পূর্বানুমতি

ইসলামী শরীয়ত মানুষের ঈমান, জান, মান, জ্ঞান ও ধনের সুরক্ষা ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য বহু আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছে। ইসলাম সর্ব বিষয়ে পবিত্রতাকে পছন্দ করে। তাই মানুষের নির্মল চরিত্র গঠনে এবং কলঙ্কহীন সমাজ গঠনে অনুপম ও নজীরবিহীন যে নীতি ইসলাম পেশ করেছে তা বিশ্বের আর কোনই সমাজনীতি বা আদর্শে বিদ্যমান নেই। পবিত্র ও দায়িত্বশীল জীবন-যাপনের জন্য পবিত্র বিবাহ-রীতি বিশেষ শর্তাবলীর সাথে প্রচলিত করেছে। অতি প্রয়োজনে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাকও বৈধ করেছে। দায়িত্বহীন অবৈধ সম্পর্ক ব্যভিচারকে হারাম এবং তার নির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষণা করেছে। বরং ব্যভিচারের প্রতি পদক্ষেপের প্রত্যেক কারণ, সুযোগ ও ছিদ্রপথকে বন্ধ করে মানুষকে সুন্দর নির্মল জীবন এবং সম্ভ্রম ও মর্যাদাপূর্ণ সংসার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রত্যেক নর-নারীকে স্বীয় লজ্জাস্থানের হিফাযত করতে এবং চক্ষু নিচু করে চলতে আদেশ দিয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদেরকে গম্য পুরুষদের দৃষ্টি থেকে পর্দা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছে। কারো চরিত্রে কলঙ্ক বা

অপবাদ রটাতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং এর অপরাধীর জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধি নির্ধারণ করেছে। ঘোষণা করেছে যে,

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}

“যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার (কামনা বা) পছন্দ করে তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” (সূরা আন-নূর (২৪) : ১৯)

সঙ্গত ও নৈতিক চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং অশ্লীলতা ও নোংরামী প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ইসলাম এটাই চেয়েছে যে, যাতে মানুষের পবিত্র বন্ধন স্থায়ী ও নির্মল হয় এবং ব্যভিচারের কোন সুযোগ ও সুরাহা অবশিষ্ট না থাকে।

এই উদ্দেশ্যেই ইসলাম নারীকে নগ্ন (পাতলা, ছোট, খাট, আঁট-সাঁট) দৃষ্টি আকর্ষক ও সুগন্ধিত পোষাক পরিধান করে বা কোন বাজনাদার (নূপুর) জাতীয় কোন অলঙ্কার পরে বাইরে যেতে নিষেধ করেছে। কোন গম্য পুরুষের সাথে সফর করতে বা নির্জনতা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছে, কোন গম্য পুরুষের সাথে বিনম্রকণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করেছে। সাধারণ গোসলস্থানে (বা পুকুরঘাটে) গোসল করতে নিষেধ করেছে।

পুরুষকে কোন নারীর সৌন্দর্য দেখতে বা কারোর বাড়ির ভিতরে দৃক্‌পাত করতে নিষেধ করেছে এবং কারো বাড়ি প্রবেশ করতে বাড়ি-ওয়ালার অনুমতি নিতে আদেশ করেছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ জাল্লাশানুহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না দেওয়া হয় ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। আবার যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ‘ফিরে যাও’ তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই

তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।” (সূরা আন-নূর (২৪) : ২৭-২৮)

তাই মুমিনের উপর ওয়াজেব এমন চরিত্র ও আচরণ সাগ্রহে বরণ করা। বিনা অনুমতিতে হুট্ করে কারো বাড়ি প্রবেশ করাতে বাড়ির মহিলাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। গৃহমধ্যে---বিশেষ করে---যখন কোন পুরুষ মানুষ থাকে না, তখন মহিলারা সচরাচর সংবৃতা থাকে না। ফলে ছোঁ মেরে বাড়ি প্রবেশে তাদের গোপন অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে। স্বামী-স্ত্রী হলে তারা কি অবস্থায় থাকবে তাও ভাবার কথা। পুরুষ মানুষও এমন অবস্থায় থাকতে পারে যাতে সে কারো সন্মুখে প্রকাশ হতে লজ্জা পায়।

অনুরূপভাবে গৃহবাসীর অজান্তে বিনা অনুমতিতে কারো প্রবেশ করাতে চুরি অথবা অবৈধ ও অন্যায় উদ্দেশ্যের সন্দেহ ও অপবাদ লাগতে পারে। তাই সৃষ্টিকর্তা মুমিনকে চারিত্রিক শিক্ষা ও আদব দান করে ভদ্রতার সাথে পরকীয় গৃহে প্রবেশের আদেশ দিয়েছেন। আর এও নিষেধ করেছেন যে, গৃহবাসী অনুমতি না দিলে যেন নিজ খেয়াল-খুশী মত কারো বাড়িতে প্রবেশ না করে এবং এতে কোন প্রকারের রাগ-গোসা না করে ও পরে ঘরকে পর মনে না করে। বরং সাদা মনে নিজ বাড়ি বা অন্যত্র ফিরে যায় এবং ‘ফকীরের মত দরজায় ঘা দিতে হবে’ মনে করে আত্মসম্মানে তথা সে বাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ করে আত্মীয়তায় আঘাত না হানে।

তাছাড়া সাধারণতঃ কোন অসুবিধার খাতিরেই অনুমতি দেওয়া হয় না। নতুবা বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ বা কোন মাহরাম মহিলা না থাকলে নিজে থেকেই ফিরে আসতে হয়।

উপরন্তু গৃহস্বামীর উচিত, বাড়িকে অর্গলবদ্ধ রাখা। যাতে শরয়ী আদব সম্পর্কে কোন অজ্ঞ মানুষ হুট্ করে প্রবেশ না করে বসে। আবার এও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কোন মেহমান দরজার বাইরেই বিরক্ত না হয়ে যায়।

জনশূন্য গৃহে প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ}

“যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্য উপকার ও উপকরণ থাকলে সেখানে (বিনা অনুমতিতে) তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।” (সূরা আন-নূর (২৪) : ২৯)

পরিজনের গৃহে পানাহার

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

{.... وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}

“.....তোমাদের জন্য তোমাদের সন্তানদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগিনীগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি (কোন এতিমের তত্ত্বাবধানে) তোমাদের হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে (বিনা অনুমতিতে) আহার করা দূষণীয় নয়; তোমরা একত্রে আহার কর (এবং এটাই উত্তম) অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা এক অপরের প্রতি সালাম দেবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে (বিধিকৃত) কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।” (সূরা আন-নূর (২৪) : ৬১)

যেহেতু সাধারণতঃ উল্লেখিত পরিজনের সাথে প্রগাঢ় আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, অধিকার ও আব্দার থাকে, তাই এইরূপ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে অন্যান্য বিধিনিয়ম ও আদবও স্মরণীয়। যেমন ওদের বাড়ি প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়া; এমন কি মায়ের বাড়ি হলেও। কারণ, কেউই তার মা-কে অর্ধনগ্ন দেখতে পছন্দ করে না। ওদেরকে সালাম দেওয়া ইত্যাদি।

এক সঙ্গে পানাহার করবে ঠিকই, কিন্তু নারী-পুরুষের মজলিসে কেবলমাত্র মাহরাম; যাদের আপোষে বিবাহ আদৌ বৈধ নয় তারাই জমায়েত হতে পারবে।

অতএব সহোদর দুধ ও সৎভাই এর গৃহে ভাবী, বোনের গৃহে (বোন গেলে) বুনুই, চাচার গৃহে চাচী বা চাচাতো বোন, অথবা (নারীর পক্ষে) চাচাতো ভাই, ফুফুর গৃহে ফুফুতো বোন, অথবা (নারীর পক্ষে) ফুফা বা ফুফুতো ভাই, মামার গৃহে মামী, মামাতো বোন অথবা (নারীর পক্ষে) মামাতো ভাই, খালার গৃহে খালাতো বোন অথবা (নারীর পক্ষে) খালু ও খালাতো ভাই এবং বন্ধুর গৃহে বন্ধুর বোন, স্ত্রী-কন্যা ও (নারীর পক্ষে) সখীর গৃহে সখা ও তার ছেলে বা ভাই এবং অনুরূপভাবে শ্বশুরঘরে শালী ও শালাজ, (নারীর পক্ষে) দেওর ও নন্দাই মাহারেম বা চির অগম্য নয়। এদের আপোসে বিনা পর্দায় একত্রে পান ভোজন ও রঙ্গিন রসকথার আসর জমানো আদৌ বৈধ নয়।

যেমন, তাদের আপোসে সালাম দেওয়া-নেওয়া বৈধ হলেও মুসাফাহা করা অবৈধ ও হারাম। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “একজন (গায়ের মাহরাম) অবৈধ মহিলার দেহ স্পর্শ করার চেয়ে লোহার সুচ দ্বারা মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া অধিক উত্তম।” (ত্বাবারানী, সিলসিলা সহীহাহ ২২৬নং)

বিজ্ঞানময় প্রতিপালক আল্লাহ স্বীয় নবী ﷺ-কে কেন্দ্র করে নিমন্ত্রণ ভোজনের ব্যাপারে মুমিনগণকে ভিন্ন এক আদব শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ....}

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেয়ো; তোমরা (ভোজন পূর্বে ও পরে) কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ, (অপ্রয়োজনীয় প্রতীক্ষা) নবীর জন্য কষ্টদায়ক, সে তোমাদেরকে (উঠে যাওয়ার জন্য বলতে) সংকোচ ও লজ্জাবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। আর তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।---” (সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৫৩)

পত্নীদের কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে পর্দার অন্তরাল হতে বলার অনুমতি থাকলেও আল্লাহ এ বিষয়ে পত্নীদেরকে সম্বোধন করে বলেন,

{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (٣٣) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً}

“হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার (অবৈধ কাম) ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। এবং (কঠোরভাবেও বাক্যালাপ করো না বরং) তোমরা সদালাপ করবে। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাক্-ইসলামী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না, তোমরা নামায পড়বে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে আর তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়---তা তোমরা স্মরণ রাখবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের।” (সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৩১-৩৪)

প্রকাশ থাকে যে, নারীদের চেহারা প্রদর্শন বৈধ থাকলে, “তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে।” এ কথার কোন মূল্য থাকে না! অথচ আলকুরআনের প্রতি কথাই মূল্যবান এবং তা আল্লাহর আমোঘ বাণী।

নাবালকের জন্যও অনুমতি

সাধারণতঃ নিদ্রার সময় মানুষ পোশাক (যা সকলের সামনে পরা হয় তা) বদলে নিদ্রার নির্দিষ্ট পোশাক পরে শয়ন করে। দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের সময়ও উপরে ব্যবহৃত পোশাক খুলে অন্তর্বাস পরে শয়ন করা হয়। যাতে কিছু গোপনীয় অঙ্গ (যেমন উরু ইত্যাদি) প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর শয়নকালে এ আশঙ্কা অধিক থাকে। তাই বিজ্ঞানময় বিধানকর্তা এ বিষয়ে সতর্ক করে মানুষকে আদব দান করে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(৫৮) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি (নাবালক) তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর (বাহ্যাবরণ খুলে রাখ) তখন এবং এশার নামাযের পর, এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। (যেহেতু তারা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তাদের নজর তোমাদের এমন অঙ্গে পড়তে পারে, যেখানে নজর দেওয়া অনুচিত।) তবে এ তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের এককে অপরের নিকট তো সর্বদা যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত (সর্বদা) অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আন-নূর (২৪) : ৫৮-৫৯)

বিনা অনুমতিতে পরকীয় গৃহে উঁকি

গৃহ মানুষের দেহ ও ইজ্জত গোপন ও হেফাযত করার স্থান। নিজ গৃহে মানুষ ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে। কিন্তু কতক মানুষের নজর-রোগ থাকে, যারা অন্যের বাড়ির ভিতরে (সাধারণতঃ নারীর রূপ দর্শনে তৃপ্তিলাভের জন্য অথবা কোন কারণে) কোনও আড়ে-ফাঁকে থেকে উঁকিঝুঁকি মারে। যা নিঃসন্দেহে দুশ্চরিত্রদের কুঅভ্যাস। আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের ব্যাপারে বলেন,

"যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর গৃহে তাদের বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে এবং তারা (দেখতে পেয়ে) তার চক্ষু ফুটিয়ে দেয়, তবে তাতে কোন (দণ্ডনীয়) রক্তপণ (দিয়াত) বা অনুরূপ বদলা (কিসাস) নেই।" (মুসনাদ আহমাদ ২/৩৮৫)

রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামীগৃহ

নারী ঘরে অবস্থান করেই প্রকৃত ইজ্জত পায়। বাইরে পা বাড়ালে তার বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকে। রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা এমন এক মহিলা যাকে তার স্বামী তালাক দিলেও ইদ্দতের ভিতরে প্রত্যানীতা করতে পারে। এমন মহিলা স্বামীগৃহ হতে বের হবে না এবং কেউ তাকে ঘর হতে বের করতেও পারবে না। বরং ইদ্দত পালন পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করবে এবং স্বামী তার ভরণ-পোষণ করবে। সাজ-সজ্জায় স্বামীকে ভুলাবার চেষ্টা করবে। যাতে কাছাকাছি থেকে ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় নতুন করে

সংসার করার সুযোগ লাভ করতে পারে। পক্ষান্তরে তালাকের পরপরই ঘর ছেড়ে মায়ের বাড়ি চলে গেলে সে সুযোগ খুব একটা থাকে না। তাই এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}

"হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা কর, তখন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওদের তালাক দিও। ইদ্দতের হিসাব রেখ এবং তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; তোমরা ওদেরকে ওদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার করো না এবং ওরাও যেন বের না হয়; যদি না ওরা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এগুলি আল্লাহর বিধান। আর যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজের উপর অত্যাচার করে।" (সূরা আত-ত্বালাক (৬৫) : ১)

অতঃপর তিন মাসে তিন তালাক বা ইদ্দতের পর সে গৃহত্যাগ ও পুনর্বিবাহ করতে পারে।

বিধবা

বিধবার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই অসিয়ত করবে যে, তাদের যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া হয় এবং গৃহথেকে বের করে না দেওয়া হয়, কিন্তু তারা যদি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যায়, তবে নিয়মমত নিজেদের জন্য যা করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল-বাকারা (২) : ২৪০)

অন্যত্র বলেন,

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। (প্রসাধন, সৌন্দর্য ও সুগন্ধি ব্যবহার পরিহার করে শোকপালন করবে।) যখন তারা ইদ্দত (৪ মাস ১০ দিন) পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত কাজ (প্রসাধন সৌন্দর্য ও সুগন্ধ ব্যবহার) করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আল-বাকারা (২) : ২৩৪)

কিন্তু প্রশ্ন থাকে যে, বিধবা যদি ইদ্দত পালনের পর প্রসাধন, সৌন্দর্য (সুন্দর পোশাক ও অলঙ্কারাদি) এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে বিনা পর্দায় বহির্বাটীতে বা গায়ের মাহারেম পুরুষদের সাথে অবাধে মিলামিশা করে (অথচ কোন স্বার্থে বিবাহের খেয়ালও রাখে না) তাহলে সে ব্যাপারে গৃহকর্তার কর্তব্য কি? অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কের কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

"তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই (অবিবাহিত, ত্যক্তদার অথবা মৃতদার পুরুষ এবং অবিবাহিতা, পরিত্যক্তা অথবা বিধবা নারী) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।" (সূরা অন-নূর (২৪) :৩২)

আর যদি তা না করা হয়, তাহলে হয়তো বা কর্তার অজান্তেই বাড়ির পরিবেশ ঘোলাটে ও কলুষিত হবে। সুতরাং সাধু সাবধান!

সফর ও শয়নের আদব

মানুষ কোথাও নিঃসঙ্গ থাকলে তার নানান্ বিপদ-আপদের আশঙ্কা থাকে। মনে ত্রাস ও আতঙ্ক জাগে, শত্রু ও চোরের ভয় হয় এবং অসুখে পড়লে একাকী অসহায় হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু কোন সঙ্গী থাকলে তার সাহসও জাগে এবং সার্বিক সহায়তাও পেয়ে থাকে। তাইতো আল্লাহর নবী ﷺ নিঃসঙ্গ হতে নিষেধ করেছেন, একাকী রাত্রিবাস ও সফর করতে বারণ করেছেন। (মুসনাদ আহমাদ ২/৯১)

অনুরূপভাবে নারীকে বিনা মাহরামে (চির অগম্য পুরুষ ব্যতিরেকে) সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার একাকিনী রাত্রিবাসে তো তার অধিক ভয়। অন্যান্য ভয়ের চেয়ে লম্পটের ভয় বেশী হয় মহিলার। কারণ, মহিলার প্রধান শত্রু সে নিজেই, আপন দেহ ও যৌবনই হল তার মূলধন ও জানের কাল। তাই তারও উচিত, কোন গৃহে বা কক্ষে একাকিনী রাত্রিবাস না করা। বিশেষ করে বহির্বাটীতে, কোন সখীর ঘরে, বৈঠকখানায় বা রাস্তার ধারে কোন কক্ষে যেন রাত্রিযাপন না করে।

নচেৎ কাদা পথে পা পিছ্লাতে দেরী হবে না।

স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্যতা করে এবং সদুপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও বাধ্যতায় না আসে তবে শাস্তিমূলক আদব দেওয়ার জন্য তার শয্যা বর্জন করা হয়। (সূরা আন-নিসা (৪) :৩৪)

অথবা তাকে কোন কক্ষে একাকিনী ত্যাগ করাও যায়। (বুখারী)

কিন্তু তা বলে তাকে কোন বিপদের মুখে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

গৃহে সমাবেশ ও সামাজিকতা

আল্লাহ জাল্লাত কুদরাতুহ মুমিনদের গুণ বর্ণনা করে বলেন,

{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ....}

"তারা আপোসের পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে থাকে--।" (সূরা আশ-শূরা (৪২) : ৩৮)

পরিবারের অভ্যন্তরস্থ অথবা বহিস্থ কোন বিষয়ের কোন সমস্যা নিয়ে পরিজনের আপোষে একত্রিত হয়ে তার নিষ্পত্তি ও সমাধান অন্বেষণ করা, অথবা আগামী কাল কে কি করবে সে বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ ও নিজ কর্তব্য স্থিরীকৃত করা পরিবারের একতা, পারস্পরিক সহায়তা ও সম্প্রীতির প্রতীক ও পরিচায়ক।

যদিও গৃহস্বামী গৃহ পরিচালনার অধিকর্তা তবুও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে মত বিনিময় করে তাদেরও মতামত সঙ্গত হলে কখনো কখনো গ্রহণ করা উচিত; বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা যখন যুবক-যুবতী হয় তখন। তাতে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেষ্টতা ও অনুভূতি জাগরিত হয়। বিবাহ-শাদী, আকীকা-ওলিমা প্রভৃতি বিষয় আপোষের পরামর্শ ও মত বিনিময়ের ভিত্তিতে করলে তা শান্তিজনক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় এবং পরেও কোন একজনের উপর কোন বিষয়ের ত্রুটির বোঝা এসে চেপে বসে না।

ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার যেমন গৃহকর্তার উপর থাকে, তেমনি তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দানের দায়িত্বও তারই উপর থাকে। অনুরূপভাবে মেয়েদের সমস্যার বিষয় ন্যস্ত থাকে গৃহকর্ত্রীর উপর। বিশেষ করে যখন তারা যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন গুপ্ত সমস্যা দেখা দেয়। সে বিষয়ে অভিভাবকদেরকে লক্ষ্য

রেখে কোনও প্রকারে তার সমাধান খুঁজে দিতে হবে। যাতে তাদের কোন প্রকারের পদস্খলন না ঘটে, সে সম্বন্ধেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

এইভাবে প্রতি গৃহের মানুষ যদি একই আচরণের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ হয়ে কোন এক নেক নেতার নেতৃত্বাধীনে শৃংখলতার সাথে বসবাস করে, তাহলে সেই সমাজের পরিবার ও পরিবেশে সদা ফুটে ওঠে সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও অনাবিল শান্তি।

কলহের সময়

একই জায়গায় একই সঙ্গে একাধিক ঘটি-বাটি রাখলে ঠুং-ঠাং সংঘর্ষের শব্দ আসা অস্বাভাবিক নয়। অনুরূপ কতকগুলি মানুষ একসঙ্গে একই গৃহে বাস করে অথচ তাদের আপোষে কোন কলহ বিবাদ হয় না, এমন খুব কমই দেখা যায়। ছোট-খাট কিছু না কিছু ঘট্‌পট্‌ হয়েই থাকে। সেই সময় গৃহস্বামীর কর্তব্য সন্ধি স্থাপন করা আর সকলের উচিত, যা ন্যায় ও সত্য, তা স্বীকার ও গ্রহণ করে নেওয়া।

পরিবারের ঐক্য ও সংহতি তখনই বিনষ্ট হয় যখন দুই জনের কলহ দুয়ের অধিক লোকের নিকট প্রকাশ করা হয়। তখন পরিবার সাধারণতঃ দুই অথবা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরিবেশ তিক্ত হয়ে ওঠে। ছোট ছেলে-মেয়েদের উপর সেই কলহের মানসিক প্রভাব পড়ে। তাই বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর আপোষের কলহ অন্ততঃপক্ষে ছেলেদের নিকট যেন প্রকাশিত না হয়। অনুরূপভাবে পুত্র ও পুত্রবধূর অথবা কন্যা ও জামাতার আপোষের কলহে পিতামাতা নিষ্পত্তির জন্য যেন তাদের মাঝে হস্তক্ষেপ না করে। কারণ, বিষয় গুপ্ত ও লজ্জাকর হতে পারে।

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা তাদের কাছে বিচারভার অর্পণ না করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন বিচার-মন্তব্যের জন্য মুখ খোলা উচিত নয়। তবে মারাত্মক অন্যায় চোখের সামনে দেখলে তাতে বাধা দেওয়া তো সকলের কর্তব্য।

কলহ শাশুড়ী-বধূতে হলে (যা আজকের পরিবেশে অধিক ঘটমান) তাও গৃহ মধ্যেই সীমিত হওয়া জরুরী। শাশুড়ীর উচিত, বধূর কোন দোষ বা বদগুণ কোন আত্মীয় বা প্রতিবেশীর কারো নিকট ফাঁশ বা প্রচার না করা এবং ব্যাপার খুব ঘোরতর না হলে ছেলের নিকটেও কোন অভিযোগ না করা। যেমন বধূর উচিত, শাশুড়ী বা শ্বশুর ঘরের কোনও দোষ-ত্রুটি বা দুর্ব্যবহার মায়ের বাড়িতে প্রকাশ না করা এবং খুব গুরুতর না হলে বাড়ির বিরুদ্ধে স্বামীর কাছে নালিশ না করা। বরং যথাসম্ভব আপোষে নিষ্পত্তি, মীমাংসা ও সমঝোতা করে চলার চেষ্টা করা। সংসারের এক অপরকে মেনে ও মানিয়ে চলার অতিশয় প্রচেষ্টা করা।

তদনুরূপ বিচারকের উচিত, কারো পক্ষপাতিত্ব না করা। যাতে মায়ের মর্যাদাও বজায় থাকে এবং বউ-এর অধিকারও ক্ষুণ্ন না হয়। যেমন স্বামীরও সাংসারিক বিষয়ে একেবারে উদাসীন হওয়া অনুচিত।

কতক মা আছে, তারা সত্যপক্ষেই বড্ড বউ- কাঁট্‌কী হয়। কি জানি কেন তারা বধূ নির্যাতনে বড় তৃপ্তি পায়। (বিশেষ করে বিনা পণের বউ এবং পণলোভী শাশুড়ী হলে) বধূকে একটি দাসী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। আবার কতক বধূও আছে যারা (বিশেষ করে অধিকতর সম্ভ্রান্ত অথবা ধনী ঘরের মেয়ে হলে) গৃহে কর্তৃত্ব চায়; এমন কি স্বামীরও প্রভু হতে চায় এবং তাকে গড্ডল বানিয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে পুরুষকে পৌরুষ বজায় রেখে মা ও স্ত্রীর স্ব-স্ব অধিকারের প্রতি সচেতনশীল হতে হবে। নচেৎ সংসার জ্বলন্ত আখার মত জ্বলতে থাকবে এবং তাতেই দাম্পত্য-সুখ ভস্ম হয়ে বাতাসে উড়ে যাবে।

কলহ যদি ভায়ে-ভায়ে বা জায়ে-জায়ে হয়, তবে সে ক্ষেত্রে গৃহকর্তাকে ন্যায় পরায়ণতার সাথে নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা করতে হবে। যেহেতু সংসারে নিয়মই 'ভাই-ভাই, ঠাঁই-ঠাঁই' হওয়া। তবুও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে অমঙ্গলের তুলনায় মঙ্গল এবং অপকারের তুলনায় উপকার বেশী হয়। যদি একান্নতায় সকলের লাভ থাকে এবং কারো ক্ষতি না থাকে, তবে একটা মীমাংসা করে একই গৃহস্থালী রাখা কর্তব্য। যেমন ছোট ভাই-বোনদের পড়াশুনা বা বিবাহ ইত্যাদিতে খরচ যোগাতে যদি পিতা-মাতা সক্ষম ও সামর্থ্যবান না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কাউকে নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্য পৃথক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি পৃথগন্নতায় সকলের লাভ থাকে; যেমন একান্নবর্তী পরিবারে থেকে কাজে ফাঁকি দেয় অথবা চরিত্র দোষে অপরের ক্ষতি সাধন করে, তবে যে রোঁয়াটি খোঁচা দেয় কেবল সেইটিকেই কম্বল থেকে খুঁটিয়ে ফেলা দরকার।

পিতা-পুত্রে কলহ বাধলে, পুত্রকে আল্লাহভীতির সাথে পিতার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা জরুরী। পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ অবশ্যই মহাপাপ। তাদের মনমত চলা এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের জন্য ওয়াজেব। আর তা পিতা-মাতার পুত্রের নিকট থেকে প্রাপ্য একটি অধিকার। তবে পিতা-মাতাকেও এ বিষয়ে সত্য ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে সমঝোতা করা দরকার। ছেলের উপর অধিকার থাকলেও কোন অন্যায় অধিকার নেই। ছেলেকে অন্যায় কাজের আদেশ দেওয়া, বিবাহে পণ নিতে বাধ্য করা, অবৈধ ব্যবসায় অর্থোপার্জনে জোর করা পিতার অন্যায়। ছেলে এরূপ অন্যায় কাজে তাদের অনুগত হতে মোটেই বাধ্য নয়। ছেলে যুবক হলে তার সঙ্গে সেই শিশুর মতই ব্যবহার করা পিতামাতার জন্য সমীচীন নয়। বরং এমন ব্যবহার করা উচিত, যেমন ব্যবহার নিজ ভায়ের সঙ্গে করা হয়। আবার পিতা থেকে ডিগ্রিতে বা অন্যান্য কিছুতে বড় হলেও ছেলের উচিত, পিতাকে পিতা বা বড় ও শ্রদ্ধেয় ভাবা। কারণ, তার উপর তার পিতা-মাতার এমন ঋণ আছে যা পরিশোধ করা কোন সন্তানের পক্ষে সাধ্য নয়।

পিতা-মাতা সর্বদা ছেলের নিকট থেকে সমান পরিমাণে সেই ভালোবাসাই পেতে চায়, যে ভালোবাসা তারা তার ছোটবেলায় বা বিয়ের আগে পেত। অথচ এমন আশা দুরাশা। সংসারে মানুষের ভালোবাসার গুণ, গভীরতা ও গাঢ়তা পৃথক পৃথক। অবশ্য প্রত্যেকের হৃদয়ে যে ভালোবাসা প্রকৃতিগতভাবে থাকে তার পরিমাণ এক। আর এই

নির্দিষ্ট পরিমাণের ভালোবাসা যখন ভাগ হয়, তখনই হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়। ভালোবাসার পূর্ব পাত্রের নিকট থেকে কিছু অংশ কাটা যায়।

ধরে নেওয়া যাক্, একটি শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন তার হৃদয়ে ভালোবাসার

পরিমাণ থাকে ১০০ গ্রাম। যতদিন সে তার বাপকে চিনতে পারে না, ততদিন এ সম্পূর্ণ ভালোবাসার অধিকারিণী থাকে তার মা। অতঃপর বাপ চেনার পর তার প্রাপ্য হয় ৪৫ গ্রাম। তখন তার মায়ের ভাগে এ পরিমাণ ভালোবাসা হ্রাস পায়; যদিও ভালোবাসার গভীরতা শিশুর মনে পিতামাতা উভয়ের জন্য অনল্প থাকে।

অতঃপর সেই ছেলের যখন আরো ভাই-বোন আসে বা বড় হয়ে বন্ধুত্ব করে, তখন এ মূল পরিমাণ ভালোবাসা থেকে মা-বাপের আরো কিছু অংশ কাটা যায়।

তারপর যখন ছেলের বিবাহ হয় এবং তার যৌবন ও হৃদয়ের একান্ত কাছের একজন সঙ্গিনী লাভ করে, তখন সে তার আকর্ষণ অনুপাতে এ মূল ভালোবাসার প্রায় ৪০ অথবা ৫০ অথবা ৬০ অথবা তারও অধিক ভাগ ছেলের নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়।

তারপরেও যখন তার কোলভরা সোনামণিরা আসে, তখন তাদের নিকটেও এ ভালোবাসার একটা বড় অংশ স্থানান্তরিত হয়। ফলে এইভাবে ভাগাভাগি হয়ে পিতামাতার আশানুরূপ ভালোবাসা যে লাভ হয় না, তা বলাই বাহুল্য।

ছেলের বিবাহ দিলে পিতা-মাতার সাধারণতঃ আসল অভীষ্ট হয় সংসারের কাজ।

কিন্তু ছেলের আসল অভীষ্ট হয় দাম্পত্য সুখ-সম্ভোগ। তাই পিতা-মাতার উচিত, বউ-এর কাজের বাহাদুরী দেখার পূর্বে ছেলে-বউ-এর প্রেম ও ভালোবাসা দেখা এবং তাতে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া। কারণ, সেটাই মূল। তারপর তার সাংসারিক কাজ বা অন্যান্য কিছুর বিচার করা। অনুরূপভাবে ছেলের উদ্দেশ্য সাধন হলে তারও উচিত, পিতামাতার খিদমত বা সংসারের কর্ম-কর্তব্যের যথোচিত খেয়াল রাখা এবং ছোট খাট সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রীর কোন কুমন্ত্রণা বা নালিশে কান না দেওয়া। বরং দোষ পিতা-মাতার হলেও, সে বিষয়ে তাকে গোপনে সান্ত্বনা দান ও সহযোগিতা করা। যাতে কোন বিবাদ খাড়া না হয়ে যায় এবং যাতে সব তালই বজায় থাকে।

নচেৎ গোলে বেতাল হলে সব তিক্ত হয়ে যাবে। অবশ্য কোন তরফেরই অন্যায় সহ্য করা তার জন্য বৈধ হবে না।

গৃহকর্তার একাধিক স্ত্রী হলে প্রত্যেককে পৃথক বাসস্থান, ভরণপোষণ এবং অন্যান্য সুবিধা-সামগ্রী সমপরিমাণে প্রদান করবে এবং সকলের নিকট রাত্রিবাসের জন্য পালা নির্ধারিত করবে। নচেৎ সবার চেয়ে তিক্ত হবে দুই সতীনের ঘর। আন্তরিক প্রেমকে সমান ভাগে ভাগ করা সম্ভব না হলেও কোন একজনের (বা কেবল নতুন বিবির) প্রতি ঝুঁকে পড়া অথবা কোন একজনের ছেলেকে অধিক ভালোবাসা এবং অন্যান্যের ছেলেদেরকে উপেক্ষা করা বা দু'চোখে দেখা উচিত নয়।

সৎমা সৎছেলের মধ্যে কলহ হলে, গৃহকর্তাকে সবিশেষ সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করা উচিত। এমনও হতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার সন্তানদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন হয়। আর তার উপস্থিতিতে সদ্ভাবের অভিনয় করা হয়। তাই যথাসাধ্য তাদের আপোষে সৌহার্দ স্থাপন করা এবং স্ত্রী যেন তার সন্তানকে আপন সন্তান আর সন্তানরাও যেন তাকে আপন মা-ই মনে করে---তার প্রচেষ্টা করা।

যেমন সৎমায়ের উচিত, তার সৎ ছেলেকে নিজেরই ছেলে মনে করা এবং তাকে (মা-মরা হলে) মায়ের স্নেহ ও আদর যত্নে কোন প্রকারের অভাব না দেওয়া। ছেলের মনে কোন ভুল বা অবাধ্যতা করে ফেললে তাকে নিজের ছেলের মতই শাসন করা।

দুর্নামের আশঙ্কায় অথবা তার দায়িত্ব নয় মনে করে তাদেরকে অন্যায়ে ছেড়ে দেওয়া অথবা আদব-শাস্তি না দেওয়া তার অন্যায়। তদনুরূপ এও মনে করা অথবা প্রকাশ করা উচিত নয় যে, সৎ-ছেলে বলে সে তার বাধ্য নয়। কারণ, আপন ছেলেও মা-বাপের অবাধ্য হয়। অনুরূপভাবে মা শাসন করলে ছেলেরও এ মনে করা উচিত নয় যে, সৎমা বলেই এত শাসন করছে বা শাস্তি দিচ্ছে। কারণ, নিজের মা-ও এরূপ করে থাকে।

অবশ্য উভয় পক্ষের এক সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করলেই সংসারে অশান্তির ঝড় চলে। তখনই ছেলের পক্ষ বলে, 'সৎমায়ে সোহাগ করে, থুব দিয়ে-দিয়ে পেটি পারে।' আর মায়ের পক্ষ বলে, 'সৎমায়ের শতেক দোষ।' দুনিয়াতে খুব কম সৎমা-ই আছে যারা সৎছেলের জন্য আপন মায়ের মত হতে পারে এবং ছেলেদেরকে এ ভাবার সময় দেয় না যে, তাদের আপন মা অন্য কেউ অথবা এটা তার সৎমা। যে নিজের মায়া মমতা, স্নেহ ও প্রীতি দিয়ে ছেলের অন্তরকে পরিপ্লুত করে দেয়। যে মা তার আপন ছেলে ও সৎছেলেকে পৃথক মনে করে না। বরং সকলকে সমান চোখে দেখে। সেই মা-ই সৎ নয়, বরং সত্তমা সত্য মা ও পরমা।

কলহ স্বামী-স্ত্রীর জীবনেও ঘটে থাকে। মানুষের দাম্পত্য জীবনে কতক স্ত্রী হয় স্বামীর প্রভু, কতক হয় নেহাতই চরণের দাসী এবং কতক হয় বন্ধু। মুসলিমের স্ত্রী সহধর্মিনী ও জীবন-সহায়িকা বন্ধুই হয়। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের মূল বন্ধনই হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও ভালোবাসা।

অবশ্য শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নারীর উপর পুরুষকে কর্তা নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে তার উপর কোন অবৈধ কর্তৃত্ব করবে এবং স্বেচ্ছাচারী; অত্যাচারী ও স্বাধীন শাসনকর্তা রূপে নারীর উপর যথেচ্ছা হুকুম চালাবে, আর নারী একজন অসহায় দাসীরূপে নিরঙ্কুশভাবে পুরুষের অধীনা হয়ে তার সেই স্বেচ্ছাচারিতার কর্তৃত্ব মেনে চলবে। বরং ভক্তি ও ভালোবাসা দিয়ে সে স্বামীর আনুগত্য করবে এবং তার উপর প্রভুত্ব দাবী করবে না। স্ত্রী হল স্বামীর ছায়া, স্ত্রীর উচিত স্বামীর অনুসরণ করা; স্বামীকে দাস বানানো নয়।

তবুও কোন কারণ বশতঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন কলহ সৃষ্টি হলে যথাসম্ভব আপোষ-নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে। স্ত্রী যেহেতু এবং সামান্য দোষে তালাকের কথা কল্পনাও করবে না।

কিন্তু বিষয় যদি অতি মারাত্মক ও গোপনীয় হয় (এবং এতে স্ত্রীকেই দোষী মনে হয়; যেমন অন্যাসক্তা হয় অথবা কোন কুফ্‌রী বা শির্কী কাজ করে) তবে স্বামীর উচিত, স্ত্রীকে তা হতে বাধা দেওয়া। যদি না মানে, তবে সহজভাবে সদুপদেশ দেওয়া। যদি তাতেও বাধ্য না হয়, তবে তার শয্যাবর্জন করা, (তবে যেন তা গৃহের বাইরে না হয়।) তা সত্ত্বেও যদি নিজের দুনিয়ায় ও মনে বাস করতে চায়, তবে প্রহার করা। (তবে এমন প্রহার করা বৈধ নয়, যাতে কোন অঙ্গ কেটে-ফুটে যায় এবং তা যেন স্ত্রীর চেহারায় না হয়।) তাতে যদি তার অনুগতা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে স্বামীর আর কোন পথ অন্বেষণ করা বা তালাক দেওয়া উচিত নয়। (সূরা আন-নিসা (৪) : ৩৪)

কারণ, তালাক দ্বারা শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই বিপর্যয় ঘটে না, বরং তাদের সন্তান-সন্ততির জীবনেও এর ক্ষতিকর পরিণতি প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু যদি স্বামীর কথায় বাধ্য না হয়; অর্থাৎ স্ত্রীর অবস্থা যদি বলে, 'মারো আর ধরো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো, বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো' তবে সর্বশেষ ঔষধ হল তালাক। যা ঘৃণিত হলেও এ দাম্পত্য জীবন কম ঘৃণিত নয়! তাই এই ঔষধ খুব হতভাগ্যরাই ব্যবহার করে থাকে।

কিন্তু দোষ যদি স্বামীর হয়? যৌতুকের দাবী নিয়ে অথবা পরপর কেবলমাত্র কন্যা প্রসবের দোষ (?) প্রভৃতি নিয়ে স্বামী যদি তাকে উপেক্ষা করতে চায় তাহলে? এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (١٢٨) سورة النساء

"কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই। বস্তুতঃ আপোষ করা অতি উত্তম। কিন্তু মানুষ লালসার প্রতি আসক্ত। আর যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ ও সাবধান হও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার সংবাদ রাখেন।" (সূরা আন-নিসা (৪) :১২৮)

স্বামী যদি মদ্যপায়ী, পরদারিক বা বড় কোন অপরাধী হয় অথবা কুফ্‌রী ও শির্ক করে, তবে স্ত্রীরও উচিত স্বামীকে সদুপদেশ দেওয়া এবং এই অভিমানে দেহ-সমপর্ণ না করা অথবা অন্য কোনও যুক্তিযুক্ত কথা, কৌশল বা উপায় দ্বারা সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। ব্যভিচার বা অন্যান্য পাপ যদি সে ত্যাগ না করে, তবে তালাক নিতে পারে। কিন্তু যদি শির্ক ও কুফ্‌রী ত্যাগ না করে, তবে তার পক্ষে স্বামী স্বামীই নয়।

তালাক নেওয়া তখন ওয়াজিব হবে। অন্যথা সামান্য দোষে তালাক চাওয়া মুনাফিক মেয়েদের অভ্যাস।

পক্ষান্তরে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ যদি মিটতে না চায় এবং স্বামীও তালাক দিতে না চায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা আরো এক পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ স্বামীর পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন (জ্ঞানবান) সালিস নিযুক্ত করবে এবং তাদেরকে বুঝিয়ে আপোষ করার চেষ্টা করবে। এতে যদি এরা উভয়ে নিষ্পত্তি চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা আন-নিসা (৪) :৩৫)

পিতামাতাও তাদের ছেলে-বউ বা মেয়ে-জামাই এর মধ্যে ঝগড়া নিষ্পত্তি করতে পারে। স্বামীর কথার জবাব দিয়ে মা হাফসা (রাঃ)এর যা হয়েছিল তা শুনে তাঁর পিতা উমার ؓ সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের বাড়িতে এসে তাঁকে বকেছিলেন ও নসীহত করেছিলেন; বলেছিলেন, 'হাফসা! তোমাদের কেউ কি নবী ﷺ-এর সাথে রাগারাগি করে রাত্রি পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলে না?' হাফসা (রাঃ) বললেন, 'জী হ্যাঁ।' উমার ؓ বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে। তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহর রসূল রাগান্বিত হলে আল্লাহ রাগান্বিত হবেন না এবং তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে না? নবী ﷺ-এর নিকট থেকে বেশী কিছু চাইবে না। কোন ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি করবে না (বা মুখের উপর মুখ দেবে না।) (তিনি তোমার সাথে কথা না বললেও) তুমি তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়ো না। তোমার যা কিছু চাইবার আমার নিকট চাইবে---।' (বুখারী ৫/১৯১নং)

একদা কোন ব্যাপারে নবী ﷺ-এর সাথে আয়েশা (রাঃ) এর মনোমালিন্য হলে আবু বাক্‌র ؓ সালিসরূপে ফায়সালা করতে মেয়ের বাড়ি এলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ আয়েশা (রাঃ) কে বললেন, "কি হয়েছে তা তুমি আগে বলবে, না আমি আগে বলব?" আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'আপনিই বলুন। তবে হক ছাড়া বলবেন না!' এ কথা শুনে আবু বাক্‌র (রাঃ) মেয়ের গালে চপেটাঘাত করলে তাঁর মুখে রক্ত দেখা দিল। আর বললেন, 'হে নিজের আত্মার দুশমন! উনি কি হক ছাড়া অন্য কিছু বলেন?' এতে আয়েশা (রাঃ) উঠে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পিছনে বসে আশ্রয় নিলেন। নবী ﷺ বললেন, "আমরা আপনাকে এ জন্য ডাকি নি, আর আপনি এরূপ করবেন তাও চাই নি।" (দেখুন, তুহফাতুল আরূস ১৮৯-১৯০পৃঃ)

বহু কন্যার পিতামাতাই বলে থাকে যে, বিয়ে হয়ে গেলে মেয়ের শাসন-দায়িত্ব জামাইয়ের উপর। বিয়ের পরে তাদের সামনে বা জানতে মেয়ে কোন নোংরা কাজ করলেও তাদের নাকি বলার বা করার কিছু অধিকার নেই। জামাই যদি মেয়েকে শির্ক করায়, নামায পড়তে না দেয় অথবা বেপর্দায় রাখতে চায়, তবুও নাকি তাদের বলার বা করার কিছু নেই! আর সম্ভবতঃ এই জন্যই কথায় বলে,

'বাপের বাড়ি বউ নষ্ট, ঝি নষ্ট ঘাটে,
পান্তাভাতে ঘি নষ্ট, ছেলে নষ্ট হাটে।'

পক্ষান্তরে সৎকার্যের আদেশ ও মন্দকার্যে বাধা দান করা সামর্থ্যানুযায়ী প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজেব। সুতরাং বাপ-মা কেন বেটির কাপ বা পাপ দেখে বা শুনে চুপ থাকবে? প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা প্রতেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে তার দায়িত্বশীলতা প্রসঙ্গে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত নেবেন; সে তা যথার্থ পালন করেছে, নাকি অবহেলা প্রদর্শন করেছে? এমন কি বাড়ির কর্তার নিকট থেকে তার পরিবারের লোকজনদের ব্যাপারেও কৈফিয়ত নেবেন।" (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ জামে' ১৭৭৪ নং)

অবশ্য নারী-স্বাধীনতাবাদীদের জন্য এসব কিছু নয়। এ তো তাদের রুচির ব্যাপার।

কিন্তু মুসলিম নারী স্বামীকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব দেয়, স্বামীত্ব ও মহত্ত্বের মর্যাদা দেয়। তাই তো তার ধর্ম পাতিব্রত্য। তাই সে স্বামীর একান্ত আপন, বিশ্বস্ত ও অনুগতা হয়। তাই তো সতী স্ত্রীঃ-

১। স্বামীর কারণে স্বার্থ বলি দিয়ে তার জীবন ও মন সবই তাকে দান করে থাকে এবং আপনার কথা ভুলে গিয়ে তার মনোসুখ খোঁজে।

২। স্বামীকে তার জীবন ও মৃত্যু মনে করে, স্বামীর সুখে তার সুখ, স্বামীর দুঃখে তার দুঃখ এবং সেটাকেই তার নিজের পরম সুখ মনে করে। অতএব স্বামীকে সদা খুশী রাখে, যেমন থাকতে বলে তেমনি থাকে। যেমন পরতে বলে তেমনি পরে, যা আদেশ করে তা পালন করে। সদা হাসিমুখে স্বামীর সঙ্গে কথা বলে। স্বামীর কোন কথায় রেগে যায় না। যা করতে নিষেধ করে, তা কোনদিন করে না।

৩। কোন কারণবশতঃ আপোষে রাগারাগি হয়ে গেলে ক্ষণকালের ভিতরে স্বামীর রাগ মানিয়ে নেয়। ভুল হলে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তাতে তার কদর আরো বাড়ে। কোন কথায় স্বামীর সাথে জিদ ধরে না। স্বামীর চেয়ে নিজেকে বড় মনে করে না। যতই রাগারাগি হোক স্বামীর খিদমত করতে ভুলে না। যেহেতু স্বামী অসন্তুষ্ট থাকলে স্ত্রীর নামায কবুল হয় না। (তিরমিযী, মিশকাত ১১২২নং)

৪। যথাসম্ভব স্বামীর সকল খিদমত নিজের হাতে করে। 'পারব না বা আপনি করুন' বলে জবাব দেয় না। স্বামীর মুখের উপর মুখ দেয় না। কোন কাজে বকলে চুপ করে শোনে। কোন প্রকার টুকাটুকি বা কথা কাটাকাটি করে না। দোষ না হলে পরে স্বামীর রাগ ঠাণ্ডা হলে তাকে বুঝিয়ে বলে। এতে তার সংসার হয় বেহেশতের মত।

৫। স্বামীর মা-কে নিজের মা জানে। তার আত্মীয়কে নিজের আত্মীয় মানে। তাদের সম্মান করে, মায়ের খিদমত করে। কোন আঘাত পেলেও নিজের মনে সহ্য করে নেয়।

৬। সদা আল্লাহকে ভয় করে চলে। সময়ে নামায পড়ে। সময় বুঝে কুরআন পাঠ করে ও অন্যান্য ধর্মকর্ম করে।

৭। সর্বদা পর্দার খেয়াল রাখে। স্বামীর কোন আত্মীয়র সামনে বিনা পর্দায় বের হয় না। স্বামী তাতে আদেশ করলেও তা মানে না। একান্ত নাচার অবস্থায় কোন আত্মীয়কে দেখা দিতে হলে গায়ে-মাথায় ভালো করে কাপড় রেখে নেয়। তাদের সাথে আদব করে কথা বলে। স্বামী ছাড়া আর কারো সাথে কোন ঠাট্টা-মজাক করে না। স্বামীর আত্মীয়কে সালাম দেয়, কিন্তু মাহরাম, স্বামী বা কোন মেয়েমানুষ ছাড়া কারো সাথে মুসাফা করে না। তার নিকট ভাসুর, দেওর, নন্দাই, বুনুই সবাই সমান। কেউ উপহাসের পাত্র নয়।

৮। পড়শীর মেয়েদের সাত-পাঁচালি কোন কথাতে কান দেয় না। সকল বিষয়ে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে কাজ করে। এমন কি দান করলেও স্বামীর পরামর্শ ও অনুমতি ছাড়া করে না। বাড়ির কোন এমন কথা স্বামীকে সাজিয়ে বা বাড়িয়ে বলে না যাতে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। কারো লাগানি-ভাঙ্গানিতে থাকে না। বাইরের কোন মেয়েকে পরের কোন কথা, গীবত বা পরচর্চা ও পরনিন্দা ঘরে গাইতে দেয় না। বাধা দিতে না পারলে তার কথায় মোটেই কান দেয় না।

৯। শ্বশুর বাড়ির কোন কথা, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা মায়ের বাড়িতে বলে না। যাতে শ্বশুর বাড়ির বা স্বামীর অপমান না হয় আর মা-বাপের মনেও কষ্ট না হয়। সকল দুঃখ-ব্যথা সয়ে কেবল স্বামীর কাছে মনের কথা খুলে বলে।

১০। স্বামী তার অমূল্য ধন। স্বামী ভালো হলে তার সব ভালো। তাই স্বামীর সুখ পেলে অন্য সকল দুঃখ ভুলে যায়। অন্য কেউ তাকে যতই কষ্ট দেক্ তবুও সে স্বামীর ভালোবাসার পরশে সব মুছে দেয়। কারণ, অন্য কেউ চিরসাথী নয়। চিরসাথী শুধু স্বামীই। অতএব আর কারো মন যোগাতে স্বামীর মন সে হারিয়ে ফেলে না।

১১। স্বামীর কোনও জিনিস তার বিনা অনুমতিতে কাউকে দান করে না। যে জিনিস স্বামীর তরফ হতে উপহার, সে জিনিসকে তার বিনা অনুমতিতে আর কাউকে উপহার দেয় না।

১২। স্বামীর পছন্দে পছন্দ করে। যে জিনিস স্বামী তার জন্য পছন্দ করে আনে তাই ভালো ও সুন্দর জেনে ব্যবহার করে। কোন দিন তার পছন্দ করা কোন জিনিস, কাপড় ইত্যাদিকে সে অপছন্দ করে না। কারণ, তাতে স্বামীর মন ছোট হয়ে যায়।

১৩। স্বামীর কাছে ভুলেও কোন পরপুরুষের সুনাম বা তারীফ করে না। কারণ, তাতে স্বামীর মন ভেঙ্গে যেতে পারে। স্বামী যখন স্ত্রীর সামনে অন্য মহিলার প্রশংসা করে, তখন আসলে নিজের স্ত্রীকে গালি দেওয়া হয়। অনুরূপ স্ত্রী যখন স্বামীর সামনে অন্য পুরুষের প্রশংসা করে, তখন আসলে নিজের স্বামীকে গালি দেওয়া হয়।

১৪। স্বামীর কাছে এমন কোন শক করে না, যাতে সে তার এ শক মিটাতে না পেরে লজ্জিত হয়।

১৫। স্বামীকে 'পরের বেটা' মনে করে না; তাকে একান্ত আপন মনে করে। যেন দেহ দু'টি, কিন্তু হৃদয় একটি। শ্বশুর বাড়িকে পরের বাড়ি নয় বরং নিজের বাড়ি মনে করে।

১৬। স্বামীর কোন গুপ্ত ভেদ, অভ্যাস বা দুর্বলতা অপর কারো---কোন মেয়ে মানুষের---কাছেও প্রকাশ করে না।

১৭। স্বামীর কাছে সদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রসাধনে থাকে। তবে এমন কিছু ব্যবহার করে না, যাতে পরিবেশের উপর বেখাপ্পা হয় এবং কেউ তাকে ঠসকী বলে।

১৮। সে জানে স্বামী তার শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিস্পদ ও প্রেমাস্পদ। সংসারে যে যত রকমের ভালোবাসা পায়, স্বামী তার সবটা পায়।

দাম্পত্য সুখের জন্য চাই, প্রত্যেকের আমানত, হিতৈষিতা, সত্যবাদিতা, অন্ত রঙ্গতা, প্রেম, বিশ্বস্ততা নম্রতা, শিষ্টতা, সুস্মিত ব্যবহার ও বাক্যালাপ, এক অপরের গুণ স্বীকার এবং পারস্পরিক মূল্যায়ন।

স্ত্রী স্বামীর পৃথিবী হয়। তাইতো স্বামী তার আকাশ হয়, স্ত্রী তার শয্যা হলে স্বামী তার উপাধান হবে, স্ত্রী তার (প্রেমের) দাসী হলে স্বামী তার দাস হবে। স্ত্রীর উচিত, স্বামীর চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার বিশেষ খেয়াল করা; যাতে সে স্ত্রী থেকে কেবল সুন্দর দেখে, উত্তম শুনে এবং সুঘ্রাণ পায়।

স্বামীর উচিত নয়, স্ত্রীর সাথে ব্যবহারে বদমেজাজী হওয়া। যেমন স্ত্রীরও উচিত নয়, 'বদমেজাজী' বলে স্বামীর বদনাম করা। এর পূর্বে তাকে তার বদমেজাজের কারণ কি তা খুঁজে বের করা দরকার। স্ত্রী যদি প্রায় প্রত্যেক কাজে স্বামীর মেজাজ খাটা করে থাকে, তবে 'বদমেজাজ' তার স্বভাবে পরিণত হতে বাধ্য। স্বামী তার নিকট যা চায় তা না পেলে, যেমন রূপে তাকে দেখতে চায় তেমন রূপে না দেখলে, প্রায় কাজে অপারিপাট্য লক্ষ্য করলে সাধারণতঃ মেজাজ খারাপ হওয়ারই কথা।

সুতরাং স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আগে নিজেকে সংশোধন করা একান্ত কর্তব্য। ব্যবহারে কাঁটার মত হুল ফুঁড়ে ফুলের মত ভালোবাসা পাওয়ার আশা করা তো নেহাতই ভুল, নিতান্ত দুরাশা।

জ্ঞানী স্ত্রী রূপসী হলেও নিজ রূপ নিয়ে গর্ব করে না। রূপ তো ফুলের মত ফোটে আবার ক'দিন পরেই ফুলের মতই ঝলসে বিলীন হয়ে যায়। বরং গুণ না থাকলে রূপ তো ছাই। গুণ থাকলে ভালোবাসার অভাব থাকে না।

"দেখিতে পলাশফুল অতি মনোহর
গন্ধ বিনে কেহ নাহি করে সমাদর।
যে ফুলের সুবাস নাহি কিসের সে ফুল?
কদাচ তাহার প্রেমে মজে না বুলবুল।"

কলহ প্রতিবেশীর সাথে হলে শান্তি আলোচনার মাধ্যমে অথবা 'শান্তি কমিটি'র মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া কর্তব্য। ঝগড়া গৃহকর্তার সাথে হলে গৃহিণীর তাতে জড়িয়ে

পড়া উচিত নয়। যেমন ছেলে-ছেলে বা অবোলা পশুর (গৃহকর্তার অনিচ্ছায়) সামান্য ক্ষতি নিয়ে ঝগড়ায় পাড়া মাতানো উচিত নয়। বরং সম্ভ্রান্ত পরিবারের শান্তিই কাম্য হয়। কারণ, যাদের মান নেই তারা অপমানকে ভয় করে না। কিন্তু যাদের মান-সম্ভ্রম আছে তাদেরকে তা রক্ষার জন্য মানহীনদের অশ্লীল বাক্যের প্রতিশোধ না নিয়ে চুপ থাকা দরকার। সে সময় খেয়াল করা উচিত,

"কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে; কামড় দিয়াছে পায়,
তা বলে কি রে কুকুরে কামড় মানুষের শোভা পায়?"

ইসলাম মুসলিমকে প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও সৌহার্দ কায়েম করতে আদেশ করে। তাকে এই বলে সাবধান করে যে, "যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় এবং তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে সে মুমিন নয়।" (মিশকাত ৪৯৯১নং)

"যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না, সে ব্যক্তি মুমিন নয়।" (ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫৩৮০নং)

তাই ইসলামী পরিবেশে পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা ততোধিক বাড়ির আপোসের সাহায্য-সহানুভূতি, আদান-প্রদান, উপঢৌকন-উপহার, দান-প্রতিদান স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে, এক অপরের প্রতি আস্থা ও নির্ভর রাখে, এক অপরের নিকট বিশ্বস্ত ও সহকর্মী হয়। ঠিক এইরূপে এ পরিবেশে এক মহল্লা পাশের মহল্লার, এক গ্রাম পার্শ্বের গ্রামের, এক শহর পার্শ্বের শহরের, এক অঞ্চল পাশের অঞ্চলের, এক মহকুমা পাশের মহকুমার, এক জেলা পাশের জেলার, এক রাজ্য পাশের রাজ্যের, এক দেশ পাশের দেশের এবং এক মহাদেশ পাশের মহাদেশের অধিবাসীদের প্রতিবেশী হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ হক আদায় করলে এক সুন্দর বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দুশ্চরিত্রের গৃহে প্রবেশ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অসৎ সঙ্গী এক কামারের মত। যার সংসর্গে থাকলে তার হাপরের অঙ্গার সাথীর বস্ত্র অথবা গৃহ জ্বালায় কিংবা তার নিকট হতে দুর্গন্ধময় (ধোঁয়া) লাগে।" (বুখারী ৪/৩২৩, আবু দাউদ ৪৮২৯নং) যাতে দেহ ও পোশাকাদি দুর্গন্ধ ও কালিমাময় হয়।

'সৎ-সংসর্গে স্বর্গবাস, অসৎ সংসর্গে সর্বনাশ' একথা সকলের জানা; কিন্তু অনেকের মানা নয়। অথচ অনেকের অভিজ্ঞতা হবে যে, দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথার মাধ্যমে কত ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়। পরিবার ও পরিজনের ভিতরে বৈরিতা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ, পিতা-পুত্রের মাঝে কলহ, যোগ-যাদুর সাহায্যে কোন অভীষ্ট লাভের আশায় ক্ষতি সাধন, চুরি, মদ্য ও ধূমপান, জুয়া ও তাস খেলা, অশ্লীল ছবি ও নজরবাজি তথা বিভিন্ন কুকর্ম এ কুসংসর্গের কারণেই ঘটে থাকে।

তাই গৃহস্বামীর উচিত, যার দ্বারা এরূপ কোন ক্ষতিসাধনের আশঙ্কা থাকে, তাকে নিজের বাড়ি প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া। আপন ছেলেদেরকেও তার সাথে উঠাবসা বা মিলামিশা করতে বাধা দেওয়া এবং ছোট ছেলেদেরকেও এমন ছেলে বা লোকের সাথে কথা বলতে না দেওয়া। যদি কোন ভ্রষ্টা মেয়ে হয়, তবে নিজের মেয়েদের সাথে তার সখীত্ব গড়তে অথবা ছেলেদের সাথে তার সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা বলতে সুযোগ না দেওয়া। কারণ এখানে ঢিল দিলে একটু পরে আর আঁটা সম্ভব হবে না।

পুরুষদের উপর নারীর বহু অধিকার আছে। তন্মধ্যে তাকে নিরাপদে রাখা এবং সতীত্বধর্মে সহায়তা করাও এক বড় অধিকার। অনুরূপভাবে নারীর উপরও স্বামীর বহু অধিকার আছে। তন্মধ্যে স্বামীর প্রেমে ও রুচিতে কোন প্রকারের আঘাত না দেওয়া, নিজের আসক্তি ও ভক্তিতে স্বামীর সাথে পরপুরুষকে অংশী না করা একটি বড় অধিকার।

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের স্ত্রীর উপর তোমাদের অধিকার এই যে, (তোমাদের অবর্তমানে) তোমরা যাকে অপছন্দ ও ঘৃণা কর, তাদেরকে তোমাদের শয্যা দলন করতে যেন সুযোগ না দেয় এবং যাকে অপছন্দ কর, তাকে তোমাদের গৃহে (প্রবেশের জন্য) যেন অনুমতি না দেয়।" (তিরমিযী ১১৬৩নং)

সুতরাং এ বিষয়ে নারীকে হতে হবে সচেতনশীলা, স্বামীর বন্ধুর মাঝে যদি এমন কিছু কু-স্বভাব লক্ষ্য করে, তবে স্বামীকে সে বন্ধুত্ব নষ্ট করতে বাধ্য করতে হবে।

আবার স্বামী বা পিতা যদি তাকে কোন সখীত্বে বা কোন প্রতিবেশী বা আত্মীয়র বাড়ি যেতে বাধা দান করে, তবে তাকেও হাসি মনে মেনে নিতে হবে। কারণ, সম্ভবতঃ তারা তাদের বাড়িতে এমন কিছু লক্ষ্য করেছে, যা তার নারীধর্মে ক্ষতি সাধতে পারে। পক্ষান্তরে যে সখীত্বে স্বামী বা পিতা সম্মত, কেবল সেই সখীত্বে মন দেওয়া দরকার। কারণ, বাইরের কারো পরিবেশের বিষয় মেয়েরা সহজে বুঝতে পারে না। যার জন্য তাদের বিবাহে অভিভাবক জরুরী হয়।

যথাসম্ভব ঘরে বাস

গৃহস্বামীর উপস্থিতি পরিবারের শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য বড় হিতকর।

এতে ভালো মন্দের আদেশ-নিষেধ, প্রতি কাজের দেখাশোনা, পরিজনের তত্ত্বাবধান ও সকলের খোঁজ খবর রাখতে পারা যায়। সাংসারিক ও চারিত্রিক ব্যাপারে পরিজনের সহায়তা করা যায়। অতএব গৃহে বাস করাটাই বা কোন জরুরী কাজ না থাকলে পরিজনের নিকট থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বর্তমানে কিছু লোকের কাছে সেটা অবাঞ্ছনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরং ফাঁক পেলেই বাড়ি হতে বাইরে যাওয়ার জন্য পিঞ্জারাবদ্ধ পাখীর মত ছট্‌ফট্ করে এবং বাইরে থাকাটাই প্রশংসনীয় ও ভাল মনে করে। ভাবে বাড়িতে তো মেয়েরা থাকে;

অথচ তার বিবি থাকে না। সব ছেড়ে কোন 'টি স্টল' অথবা তাস বা কেরামের আড্ডায়, অথবা কোন পার্কে বন্ধুদের আসরে সময় কাটায়। রাত্রি দ্বিপ্রহর হলে বা তার পরে বাড়ি ফিরে! পক্ষান্তরে জ্ঞানী ও পরিণামদর্শী গৃহস্বামী এমনভাবে সময় বরবাদ করে না। বরং পরিবার ও পরিবেশের উন্নয়নকল্পে কাজ হাল্কা করে নিজ বাড়ি ফিরার চেষ্টা করে।

আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে বাস ছাড়া অযথা বাইরে কাটায় না।

কিন্তু খেলার ঘোরে উন্মত্তরা জানে না যে, তাদের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র এঁটেছে। খেল, তামাশা ও বিভিন্ন রঙ্গমহলের মাধ্যমে তাদের ধর্ম লুটার ফন্দি, নারী ও স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে ইজ্জত লুটার চক্রান্ত, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম (রেডিও, টি,ভি, ভিডিও প্রভৃতির) সাহায্যে মুসলমানদের গৃহে ও পরিবেশে যথাসম্ভব অশ্লীলতা ও নোংরামীর অনুপ্রবেশ ঘটাবার কূট-কৌশল, বিভিন্ন ক্লাব সংঘ ও থিয়েটারের প্রমোদ-বিহারের মাধ্যম্যে চরিত্র বিনাশ করার এবং গৃহকর্তাকে পরিবারের তত্ত্বাবধান হতে যথাসম্ভব সম্পর্ক ছিন্ন করে সকলকে চরিত্রহীন করার ফিকির ও ছল ইত্যাদির জাল বিস্তার করে রেখেছে। খুব চালাক মৎস্য ছাড়া বাকীরা যে সহজে এ জালে ফেঁসে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যারা আমাদের এ তত্ত্ব মানতে চায় না, তারা হয়তো বড় উদার চিত্তের মানুষ। তাই তাদের বাড়ি লুটলেও তারা সেই চোরের সাথেই বন্ধুত্ব করে। আর কাফেরদের বিষয়ে তো এ সব বিশ্বাসই করবে না। ভাববে, এ সব সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার উসকানি! অথচ তার উল্টটাই সঠিক ও ঘটমান। যদি তারা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ ও তার পরের ইয়াহুদী গুপ্ত সম্মেলনের বিষয়াদি পড়ত বা জানত, তাহলে তাদের এ ভুল ভেঙ্গে যেত। অজান্তে ও চক্রান্তে পড়ে রাক্ষসপুরীতে ছদ্মবেশিনী রাক্ষসীর সাথে বিলাস-বিহার পরিত্যাগ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করার শত চেষ্টা করত।

বাড়িতে না থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের তরবিয়তের যে ক্ষতি হয়, তা বলাই বাহুল্য। বাদশা মনসূর তাঁর জেলে বন্দী বনী উমাইয়্যার কয়েদীদের প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'দীর্ঘদিন ধরে জেলে বন্দী থাকার ফলে তোমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি কি হয়েছে বলে মনে কর?' কয়েদীরা জবাবে বলেছিল, 'আমাদের ছেলে-মেয়েদের তরবিয়ত।' ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, 'ছেলেদের নষ্ট হওয়ার পশ্চাতে কারণ ও ত্রুটি বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই তাদের পিতার অবহেলা ও ত্রুটির ফলে নষ্ট হয়ে থাকে।'

বাড়ির তত্ত্ব-তল্লাশে সূক্ষ্মতা

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সচেতনশীল গৃহস্বামী অতি সূক্ষ্মতা ও যত্নের সাথে পরিবারের গতিবিধি ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করে।

তার স্ত্রী স্বকর্তব্য পালন করছে কিনা? তাকে ধোঁকা তো দেয় না? তার ছেলেদের বন্ধু-বান্ধব কে? তার কাছে তাদের কোন পরিচয় আছে কি? কোন চরিত্রহীন বদমাশরা তো তার বন্ধু নয়? তাদের সাথে বাইরে কোথায় যায়? কেন যায়? কোনও অন্যায় কাজে তো নয়? ছেলেরা বাইরে রাত্রিবাস তো করে না? করলে কোথায় করে? কোন রঙ্গমহলে তো নয়? কোন গোপন প্রণয়িণীর কাছে তো নয়? তাদের বই-পত্রে, বিছানায়, ব্যাগে ও বাক্সে কি পাওয়া যায়? কোন মাদকদ্রব্য, প্রেমপত্র তো নয়? তার মেয়ে কোথায় থাকে? কোথায় যায়? তার সখী কেমন? পথে ও স্কুল-কলেজে কি ঘটে? কোন বাহানায় বাইরে যেতে পছন্দ করে কেন? বৈঠকখানায় বা নির্জনতায় নিদ্রা যায় কেন? মন-মানসিকতা বিপরীতমুখী কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

কতক লক্ষণীয় বিষয় মায়ের দ্বারা জানা অধিক সহজ ও সম্ভব। কারণ, বাড়িতে সেই বেশী থাকে। সন্তানদের কর্মকাণ্ড তার নজরকে এড়ানো সত্যই মুশকিল; যদি সে সচেতনশীলা হয়।

কিন্তু এমন অনেক ছন্নছাড়া পরিবারও আছে যেখানে কারো কিছু বাধা নেই। কেউ কাউকে কোন কৈফিয়ত করে না। কেউ রাত করে বাড়ি ফিরলে স্ত্রী স্বামীকে, না স্বামী স্ত্রীকে, না মা মেয়েকে, আর না বাপ ছেলেকে প্রশ্ন করে 'এত রাত কোথায় হল?' ছেলে মাছ অথবা সব্জি আনলে মা প্রশ্ন করে না যে, 'কোথা হতে আন্‌লি? পয়সা কোথায় পেলি?' বরং তা কারো পুকুর বা জমি থেকে আনা শুনেও উল্টা ছেলের উপর খুশী হয়ে উন্নতির দুয়া দেয়! অথচ হয়তো বা সে চুরি করে আনে এবং তাতে উদ্দীপনা পেয়ে ধীরে ধীরে দুর্দমনীয় চোর হয়ে ওঠে। মায়ের উন্নতির দুআ অবনতি হয়ে ছেলেকে চৌর্য বৃত্তিতে নিপতিত করে। কিন্তু উচিত ছিল, তার চুরির নাম শুনে ঠাস্ করে এক থাপ্পড় মারা।

অনুরূপভাবে অনেক কু-মাতার চোখের সামনে ছেলে চোর হয়, মদ্য ও ধূমপায়ী হয়। তার চোখের সামনে মেয়ের চরিত্র নষ্ট হয়। বরং বাবা শাসন করতে চাইলে তার কাছে মিথ্যা বলে ছেলে-মেয়ের দোষ ও অপরাধ গোপন করে মা তাদের ভ্রষ্টতার সহায়িকা হয়।

এ যুগ ফিতনার যুগ। পদে-পদে পাপের ভয়। আর নারীর চেয়ে বড় ফিতনা দুনিয়াতে অন্য কিছু নেই। নারীর পশ্চাতে পুরুষরা কি চায় তা একান্ত ভুক্তভোগী নারী ছাড়া অন্য কেউ ততটা জানে না। কিশোরী বা তরুণীরা তো মোটেই না। পুরুষ (অকাপুরুষ) তো সবটাই বোঝে। তাই স্ত্রী-কন্যার বিষয়ে বড় সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখে। কোথায় যেতে পাবে এবং কোথায় পাবে না---তা নির্ধারণ করে। কিন্তু নারী তার মূল্যায়নই করতে পারে না। ফলে মা সাদা মনে কিশোরী বা ষোড়শীকে একা বাজার বা দোকান করতে পাঠায়। গায়ের মাহারেম আত্মীয়-কুটুমের খিদমত করতে আদেশ করে। (স্বামীর) পরাধীনতা আসার পূর্বে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে এখানে-সেখানে ভ্রমণে পাঠায়। ফলে সেই অবসরে যা ঘটে তা ঘটে। মেয়ে গোপন করে এবং মা-ও কোন প্রশ্নটি করে না। মা-ও খুশ মেয়েও খুশ!

অসুবিধার ক্ষেত্রে অনুকূল ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু মা সে ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করে মেয়ের জীবনে কোন গুপ্ত অথবা রটিতব্য কলঙ্ক এনে দেয়। মেয়ে নিজে ঠিক থাকলেও যার হাত থেকে সে বাঁচতে পারত না। এমনি করে কত ঘটনা ঘটে। কিন্তু রটনার ভয়ে মেয়ে বাড়িতে কাউকে প্রকাশ করে না। যার ফলে গজভুক্ত কপিত্থবৎ পরিবেশকে বাইরে থেকে বড় সম্ভ্রান্ত ও সুন্দর লাগলেও ভিতর হয় অসুন্দর।

কিন্তু গৃহস্বামীকে এসব বিষয়ে ধোঁকা খেলে হয় না। সর্বাগ্রে নিজের পরিবারে ঈমানকে মজবুত করতে পারলে কোন প্রতারণা ও ছলনারই আশঙ্কা থাকে না। যেহেতু সে কিয়ামত কোর্টে এ বিষয়ে জবাবদিহি ও প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। (নাঃ, সজাঃ ১৭৭৫নং)

তবে এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ-

১- পরিবারের তত্ত্ব-তলাশ গোপনে হবে।

২- সর্বদা ডাঁট-ধমকে সকলের পশ্চাদ্ধাবন করাও উচিত নয়। নচেৎ 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' হয়ে বসে থাকবে।

৩- বারণ ও নিবারণে, বাধা ও শাসনের ফলে যেন কেউ এমন মনে না করে যে, তাদের উপর গৃহস্বামী বা পিতামাতার বিশ্বাস নেই।

৪- শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের সময় ছেলে-মেয়েদের বয়স, বুঝশক্তি এবং অপরাধের মান খেয়াল করা অবশ্যই প্রয়োজন। যাতে 'হিতে বিপরীত' না হয় অথবা 'মশা মারতে কামান দাগা' না হয়।

৫- প্রত্যেক ছোট-খাট বিষয়েও 'চিমটি কাটা' ঠিক নয়। যেমন, প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসের হিসাব নেওয়ার চেষ্টাও ভুল। প্রত্যেক বিষয় লিখার জন্য তো সকলের কাছে 'কিরামান-কাতেবীন' নিয়োজিত আছেন।

পক্ষান্তরে এমন বহু গৃহকর্তা আছে, যারা মনে করে, 'কওড়া ঘরে বেওরা' ছেলে হয়; (হ্যাঁ, বাইরের পরিবেশ অগুণে হতেও পারে।) অতএব কড়াকড়ি করার প্রয়োজন নেই এবং ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে কোন মাথা ঘামাবারও দরকার নেই। কারণ কম-বয়সী ছেলেরা পাপকে পাপ ও অন্যায়কে অন্যায় বলে জানতে ও মানতে পারে না। এ বয়সে তারা অন্যায় করবে এবং বড় হলে নিজে নিজে অন্যায় চিনবে। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তাদেরকে নিজে নিজে গড়ে ওঠার ও পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে এটা হল, পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লাগা একটি অভিমত।

অনেকে তার ছেলেমেয়েকে এত স্নেহাদর করে ও ভালোবাসে যে, তারই জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পাপেও মুখ খুলতে চায় না। অনেক সময় পাপকে সমর্থনও করে এবং শাস্তির সময় তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে! অনেকে তার নিজ পিতার (অযৌক্তিক) কঠোর শাসনের উপর তার বিরক্তির কথা মনে রেখে নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে মোটেই শাসন করে না। ভাবে, বাবা ভুল করে আমাকে জ্বালিয়েছিল, আমি আমার ছেলে-মেয়েকে জ্বালিয়ে ভুল করব না।

আর অনেকে নিজের উপর অনুমিতি করে ডোর একেবারেই ছেড়ে দেয়; বলে, 'সময়ে সবাই ভুল করে। ছেলে-মেয়েদের বয়স চাপলে একটু-আধটু ফক্কর-ফাজিল হবে বৈ-কি? এটাই তো ওদের সময়! সংসারে পড়লে সব শুধ্‌রে যাবে!' এরূপ বলে, যেহেতু সেও তার সময়ে ঐরূপ ছিল তাই।

কিন্তু এমন গুণের গার্জেনরা কি চিন্তা ও ভয় করে না যে, কাল কিয়ামত-কোর্টে যখন তাদেরকে তাদের সন্তানরা সম্ভবতঃ তাদের গর্দান ধরে প্রশ্ন করবে, 'কেন আমাকে পাপে বাধা দাওনি?' তখন তারা কি উত্তর দেবে? অথবা মূলে কিয়ামত বা পরকালকে বিশ্বাস করে না কি? গৃহকর্তার সতর্ক থাকা উচিত, যাতে আলোক প্রাপ্তির দাবী করে 'দাইয়ুস' সেজে না বসে। কারণ, 'দাইয়ুস' জান্নাতে যাবে না। আবার যারা ধর্মের আলোকে আলোকিত তাদেরকে 'গোঁড়া' বলে নাক সিটকিয়ে 'মেড়া' সাজা মোটেই উচিত নয়।

শিশু প্রতিপালন

শিশু প্রতিপালন বা ছেলে মানুষ করার অর্থ শুধু এই নয় যে, কেবল মাত্র দুগ্ধাদি, খাদ্য-পানীয় খাইয়ে, পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে যত্নের সাথে বড় করা। বরং তাকে চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষা দান করে (মানুষের মত) মানুষ করে গড়ে তোলাই হল প্রকৃত মানুষ করা। এই মানুষ করার জন্য মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃত মানবতার ধর্মমত গ্রহণ করা।

ধর্মপথ ব্যতীত কোন পথেই তার ছেলে মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। এ কথার অর্থ এ নয় যে, সকলকে আলেম হতে হবে। তবে ধর্মের নির্দেশমত তাকে চলতে হবে জরুর। আবার আলেম হলেই বা আরবী জানলেই কেউ মানুষ হয়ে যাবে না।

কারণ, তার জন্য আমল ও পালন প্রয়োজন আছে। যেমন, আবুজেহেল এ ধরনের আলেমদের চেয়েও অধিক আরবী জানত। কিন্তু সে প্রকৃতার্থে মানুষ বা আলেম ছিল না। যার জন্য তার নামই ছিল আবু জাহ্‌ল; অর্থাৎ মূর্খের বাপ।

ছেলেকে উকিল হোক বা ডাক্তার, মাষ্টার হোক বা প্রফেসর, চাষী হোক বা ব্যবসায়ী, ম্যাকানিক বা বৈজ্ঞানিক করার আগে প্রথমে 'মুসলিম ও মুমিন' করতে হবে। শুধু নামে নয়, দামে ও কামে।

শিশুর বাক্‌শক্তি এলে যেন সর্বপ্রথম ইসলামী মূলমন্ত্র কলেমা মুখস্থ করতে পারে। যেমন জন্মক্ষণে যেন সর্বপ্রথম তার কর্ণকুহরে আযান (আল্লাহ সর্বমহান) ধ্বনি মুখরিত হয়। অতঃপর শিশু (অধিকাংশ) মায়ের নিকট স্নেহ শেখে, ভাষা শেখে, আর শেখে লজ্জাশীলতা ও বহু কিছু। অতঃপর সে 'মা' বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পাঠশালায় যেতে শেখে। সর্বপ্রথম তার প্রয়োজন হয় মাতৃভাষা শিক্ষার। অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাষা শিক্ষার সাথে আরবী ভাষাও (অন্ততঃপক্ষে অক্ষর ও পাঠ্যজ্ঞান) শিখা একান্ত জরুরী। কারণ, এতে তার ধর্ম, মানবতা, চরিত্র ও ইহ-পরকালের প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে।

এসব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিখলেও শিখা যায়। কিন্তু মুসলিম কমপক্ষে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পবিত্র বাণী আল-কুরআন পাঠ করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার সুযোগ ও সৌভাগ্যকে হেলায় হারিয়ে দেয় না; যা মাতৃভাষায় তার উচ্চারণ বা অনুবাদ পড়লে লাভ হয় না।

মোটকথা প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে ঈমান ও চরিত্র শিক্ষাদান অভিভাবকের অপরিহার্য কর্তব্য থাকে। কুরআন শিক্ষা ও হিফ্‌য করানো, বিভিন্ন দুআ দরূদ মুখস্থ করানোর এটাই সময়। তাদের সরল হৃদয়মনে এই সময়েই ইসলামী চরিত্র ও পরিবেশের বীজ বপন করে দিতে পারলে পরের ধাপে তত কষ্ট হয় না। বা বড় হয়ে তার ভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা খুব কম থাকে।

এই সময় (অধিক ক্ষেত্রে) স্নেহময়ী মা ছেলেকে বিভিন্ন আদব দান করবে। আল্লাহর মহিমা, বিশ্বজগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ইসলামী ঐতিহাসিক বিভিন্ন কাহিনী, আদর্শ গল্পী, ছড়া, গজল প্রভৃতি বর্ণনা করা ও বলার মাধ্যমে তার স্মৃতিস্থ করাবে। ভালো ছেলেদের ভালো কাজের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের প্রশংসা এবং মন্দ ছেলেদের মন্দকাজের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের দুর্নাম করবে। যা শুনে শিশু ভাল হওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করবে। তার ভুলকে স্নেহ দিয়ে অথবা প্রয়োজনে ধমক ও মৃদু প্রহার করে সংশোধন করবে।

বিছানায় শয়ন করে নিদ্রার পূর্বে হযরত নূহ ﷺ-এর তুফান ও তাঁর ছেলের কাহিনী, হযরত ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর পিতার মতবিরোধিতা, মূর্তি ভাঙ্গা ও আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কাহিনী, হযরত মূসা ﷺ ও ফিরাউনের কাহিনী, মাছের পেটে হযরত ইউনুস ﷺ-এর কাহিনী, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিভিন্ন চারিত্রিক কাহিনী, সাহাবা ও সালেহীনগণের জীবন-ইতিহাস, আসহাবে কাহফ ও উখদুদের কাহিনী প্রভৃতি মা সুন্দর করে বলবে এবং তাতে যে শিক্ষা ও উপদেশ লাভ হয়---তা তাকে বিশ্লেষণ করে বুঝাবে। আর এমন রূপকথা, ভুতুড়ে কল্পিত কাহিনী শুনাবে না, যাতে শিশুর মনে ভয়, আতঙ্ক, কাপুরুষতা ও ভীরুতার সঞ্চার হয়।

দুষ্ট ও মন্দ প্রকৃতির অসভ্য ও চোয়াড় ছেলেদের সংসর্গ হতে দূরে রাখবে এবং সভ্য ও ভালো ছেলেদের সাথে তার বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। অথবা গৃহ মধ্যেই ভায়ে-ভায়ে, বোন-বোনে বা ভাই-বোনে খেলতে সুযোগ ও আদেশ দেবে। শিক্ষামূলক ও শিশুর জ্ঞানবর্ধক খেলনা ক্রয় করে নির্দিষ্ট কক্ষে রক্ষিত করবে; যেখানে তাদের খেলার সাথে জ্ঞানের কলিও বিকশিত হবে। বাজনা, বাঁশী বা কোন রুচিবিরুদ্ধ খেলনা খবরদার তাদের হাতে দেবে না।

শিশুর সাত বছর বয়স হলে নামাযের আদেশ দেবে এবং অন্যান্য ইবাদতের উপর ট্রেনিং প্রদান করবে। একটু বড় (দশ বছরের) হলে ছেলে ও মেয়ের বিছানা পৃথক করে দেবে, নতুবা গা-ঢাকার লেপ বা কম্বল ভিন্ন করবে। আর সম্ভব হলে ছেলেদের ও মেয়েদের পৃথক পৃথক শয়নকক্ষ নির্দিষ্ট করবে। পিতা-মাতাও তাদের

নিকট হতে গোপনীয়তা অবলম্বন করবে। যদি দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে নামাযী না হয়, তবে তার জন্য তাকে প্রহার করবে। (আহমদ, আবূ দাউদ প্রমুখ, মিশকাত ৫৭২নং)

সন্তান মাতা-পিতার নয়নমনি ও স্নেহের পুতুল হয়। কিন্তু অনেকে তাদেরকে আদর-আহ্লাদ করতে কুণ্ঠাবোধ করে। অথচ আল্লাহর নবী ﷺ শিশুদের সাথে আমোদ করতেন। আদর-সুরে ডাকতেন, মাথায় হাত বুলাতেন, শিশুকে জিব দেখিয়ে প্রলুব্ধ ও আনন্দিত করতেন। (সিলসিলাহ সহীহাহ ৭০নং)

শিশুর পশ্চাতে ছুটে ধরাধরি করে হাসাহাসি করতেন এবং তাদের গালে চুমু দিতেন ইত্যাদি। (ইমাঃ) যেমন গৃহিণীর উচিত, শিশুদের জন্য (বা বাড়ির সকলের জন্য) খাবার, পড়ার, খেলার ও ঘুমাবার সময় নির্দিষ্ট করা। যাতে পরিবারের কোন কাজে কেউ কারো ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে, আর এতে সুশৃঙ্খলতার অনুশীলন হয়।

পিতা-মাতা তাদের শিশুর মনে ঈমানী স্পৃহা ও তার সাফল্যের আশা জাগিয়ে তুলবে। বেঈমানী ও বেআদবীর মন্দ পরিণাম ব্যাখ্যা করবে। জান্নাতের লোভ ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করবে। এমন শিক্ষা দেবে যাতে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করে। তাঁর প্রভুত্ব ও শক্তি ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব ও শক্তিতে বিশ্বাস করে শির্ক না করে।

সঙ্গে মসজিদ নিয়ে গিয়ে জামাআতে হাজির হওয়ার অনুশীলন প্রদান করবে। এমন সন্তান মানুষ করবে। যেন (পিতা-মাতার) মৃত্যুর পর সে তাদের জন্য দুআ করে।

কিরাম বোর্ড, তাস প্রভৃতি খেলা হতে বাধা দেবে, অশ্লীল ছবিবিশিষ্ট বা যৌন সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পড়তে সুযোগ দেবে না। যেমন, সিনেমা, ভিডিও বা টিভি-হাউসে যেতে বাধা দান করবে। মেলা, যাত্রা, থিয়েটার ও অন্যান্য অশ্লীলতায় যেতে দেবে না। আর ধূমপানের ছোঁয়া হতে সুদূরে রাখবে।

সর্বদা সত্য বলতে অভ্যস্ত করবে। উপহাস করেও তার সাথে মিথ্যা বলবে না।

তাছাড়া মিথ্যা করে শূন্য হস্তের মুষ্টি বন্ধ করে তাতে কিছু আছে বলে শিশুকে ধারণা দিয়ে ডাকাও বৈধ নয়। (আহমাদ)

অনেক পিতা বাড়িতে থেকে যখন তার কোন অপছন্দনীয় লোক দরজায় ডাক দেয়, তখন সে তার শিশুকে বলে, 'লোকটিকে গেয়ে বল, আব্বা বাড়িতে নেই।' এই ধরনের কোন মিথ্যা আদেশ শিশুকে অবশ্যই দিতে নেই।

বাড়ির কোন জিনিস, টাকা-পয়সা চুরি করলে তাতে ঢিল দেওয়া উচিত নয়।

তেমনি ছেলের প্রতি এমন মনোভাব রাখা উচিত নয়, যাতে সে পরের পুকুরে মাছ, পরের জমিতে ফসল, পরের বাগানে ফল আনতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়। যেমন কোনও মন্দ ও অশ্লীল বিষয়ে শিশুকে অনুপ্রাণিত করা সমীচীন নয়।

শকের ছেলে হলেও এমন আদুরে করা উচিত নয়; যাতে সে তাদেরই অবাধ্যতা করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ধোঁকা ও ভেজাল দিয়ে কাউকে ব্যবসা করতে, ঘুস ও সূদের সাহায্যে পয়সা উপার্জন করতে অনুপ্রেরণা বা আদেশ দেওয়া আদৌ বৈধ নয়।

শিশুর দুষ্টামি বা কোন ভুলের সময় পিতামাতার বদ্দুআ করা উচিত নয়। বরং উচিত হল, শাসন করে সংশোধনের জন্য নেক দুআ করা। কারণ, ছেলেদের জন্য পিতামাতার দুআ কবুল হয়ে থাকে।

শিশু-কন্যাকে পর্দা ও বিভিন্ন আদব-কায়দার শিক্ষা দান করবে। ছোট থেকে পা পর্যন্ত জামা পরা এবং বক্ষে কৈশোরের প্রতীক প্রকাশের সাথে সাথে মাথায় উড়না পড়ার অভ্যাস করাবে। আর গায়ের মাহারেম আত্মীয় পুরুষ বা কিশোর থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করার শিক্ষা ও আদেশ দান করবে। টাইট ফিট, খাটো বা পুরুষ-সুলভ কোন পোষাক পরতে সুযোগ দেবে না।

সন্তানকে পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দান করবে। তার স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন অনুশীলন (যেমন নিয়মিত মুখ ধোয়া, প্রস্রাবের পর পানি নেওয়া, নখ কাটা, খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া ইত্যাদির শিক্ষা) প্রদান করবে। প্রতি কাজে ডান হাত এবং ময়লাদি পরিষ্কার করতে বাম হাত ব্যবহার করার শিক্ষা দেবে।

কাজের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' এবং সকল কাজের শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' পাঠ ও অন্যান্য দুআ-দরূদ শিক্ষা দেবে।

শিশু প্রতিপালন ও শিশুকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে পিতা অপেক্ষা মাতার ভূমিকা অধিক গুরুতর। তার শিক্ষার জন্য সকল স্কুল অপেক্ষা মায়ের কোলই শ্রেষ্ঠ স্কুল। যেহেতুঃ

'মায়ের হাতে গড়বে মানুষ মা যদি সে সত্য হয়
মা-ই তো এ জগতের প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।'

সন্তানের কর্তব্য

জনক-জননীর সন্তানের উপর বড় অধিকার আছে। তাই তাদের প্রতি তার মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পালন করা উচিত।

সন্তান কথাবার্তায় ও সম্বোধনে তাদের সঙ্গে আদব, বিনয় ও শ্রদ্ধা অবলম্বন করবে। তাদের কোন কথায় 'উঃ' কিংবা বিরক্তিসূচক কোন উত্তর এবং ভর্ৎসনা করবে না। বরং সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। (সূরা আল-ইসরা (১৭) : ২৩)

কোন গোনাহর কাজে ছাড়া সর্বদা সর্বকাজে তাদের বাধ্যতা স্বীকার করবে। তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে না এবং ভ্রূকুঞ্চিতও করবে না।

লোক মাঝে তাদের সম্মান ও সুনাম আরো উজ্জ্বল করবে। যাতে তাদের বদনাম হয় এমন কাজ ভুলেও করবে না।

তাদের ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার সংরক্ষণের দায়িত্বও তার উপর। তাদের বিনা অনুমতিতে তাদের একটি পয়সাও লুকিয়ে রাখবে না।

সদা সেই কাজের চেষ্টা ও প্রয়াস রাখবে, যাতে তারা খুশী ও লোক সমাজে উন্নতশির হতে পারে।

তার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করবে। মতামতে অনৈক্য থাকলে তাদের কাছে বিনয়াবনত হয়ে যথাযথ ওজর পেশ করবে।

সর্বদা তাদের ডাকে হাসিমুখে সাড়া দেবে এবং যা আদেশ করে, তা পালন করবে। তাদের বন্ধুদের সম্মান করবে।

তাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে বিতর্ক করবে না। যথাসম্ভব যথার্থতা বিদিত করার চেষ্টা করবে এবং তাদেরকে কোন সময় তুচ্ছজ্ঞান করবে না। তাদের সামনে বা কথার উপরে নিজের গলা উঁচু করবে না।

তাদের তা'যীম করবে এবং না ঝুঁকে সালাম-মুসাফাহা করবে ও মাথা চুমবে।[৩] (ঝুঁকে বা পা স্পর্শ করে সালাম বৈধ নয়।) তারা নীচে বসলে তাদের চেয়ে কোন উঁচু জায়গায় বসবে না। বসার সময় তাদের প্রতি পা বাড়াবে না। অথবা পায়ের উপর পা রেখে তাদের সামনে সগর্বে বসবে না।

বাড়িতে মায়ের সাংসারিক কাজে সহায়তা করবে এবং যথাসম্ভব পিতার বাইরের কাজেও সহায়তা করবে।

একান্ত জরুরী অবস্থা ছাড়া তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে বিদেশে থাকা উচিত নয়।

প্রয়োজনে থাকতে হলে চিঠি-পত্রাদির যোগাযোগ অবশ্যই রাখবে।

তাদের শয়নকক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না। তাদের উপর কোন প্রকার মিথ্যা বলবে না। নিজ স্ত্রী ও সন্তানকে তাদের উপর প্রাধান্য দেবে না। সকলের স্ব-স্ব অধিকার আছে সব কিছুর আগে তাদের তুষ্টি কামনা করবে। কারণ, তাদের তুষ্টিতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত আছে।

পুত্র যতই উচ্চপদস্থ অফিসার হোক পিতার পরিচয় গোপন করবে না। সম্মানের লাঘব হবে মনে করে নিজের নামের সাথে পিতার নাম জুড়তে লজ্জাবোধ করবে না।

[3] অনুরূপভাবে পিতা-মাতা বা গুরুজনদের হাতে বুসা দেওয়াও বৈধ। তবে তার কয়েকটি শর্ত আছেঃ- শ্রদ্ধাস্পদ যেন গর্বভরে হাত প্রসারিত না করে, শ্রদ্ধাকারীর মনে যেন তাবার্রুক বা বর্কত নেওয়ার খেয়াল না থাকে, বুসা দেওয়া বা নেওয়াটা যেন কোন প্রথা বা অভ্যাসে পরিণত না হয়, ওর স্থলে যেন মুসাফাহা পরিত্যক্ত না হয় এবং বুসার সময় হাতকে নিয়ে কপালে যেন স্পর্শ না করা হয়। (সিলসিলাহ সহীহাহ)

তাদের উপর খরচ করতে কার্পণ্য করবে না। তাদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করবে। তাদের জন্য বিভিন্ন উপঢৌকন পেশ করবে। লালন-পালন ও মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য সর্বদা তাদের শুকরিয়া আদায় করবে।

তাদের সঙ্গে বিবাহ বা তালাক নিয়ে কোন মতানৈক্য হলে ধর্মীয় ফায়সালা গ্রহণ করবে। তাদের নেক দুআর আশা করবে এবং বদ্দুআ হতে বেঁচে থাকবে। কারণ তাদের দুআ সন্তানের হকে মঞ্জুর করা হয়।

তাদেরকে গালি দেবে না, গালি খাওয়াবেও না। কারো পিতামাতাকে গালি দিয়ে পরিবর্তে সে তার পিতা-মাতাকে গালি খাওয়াবে না। কারণ, তা কাবীরাহ গুনাহ। (বুখারী, মুসলিম)

তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দুআ এবং সদকা করবে।

সন্তানের নিকট পিতার চেয়ে মাতার কদর তিনগুণ অধিক। প্রত্যেক পিতা-মাতাই নিজ সন্তানের কাছে সদ্ব্যবহার ও সদাচারের আশা করে। আপন সন্তানদের নিকট সেই আশা রেখে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত। নচেৎ যেমন কর্ম, তেমনি ফল পাবে।

নারীর কর্মক্ষেত্র

ইসলাম পবিত্রতা, সততা, সভ্যতা, শ্লীলতা, নিষ্কলঙ্কতা, সম্ভ্রম, আভিজাত্য ও কৌলীন্যকে পছন্দ করে। সদাচার ও সুচরিত্রের শিক্ষা দেয়। অশ্লীলতা, ভ্রষ্টতা ও ইজ্জতহানিকে বড় ঘৃণা করে। ইসলামী অনুশাসন এক অপরের সাহায্যের মাধ্যমে পালিত ও মান্য হয়ে থাকে। এক বিধান অপর বিধানকে মানতে সহায়তা করে। তাই আল্লাহ তাআলা যখন নারীদেরকে বললেন, {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} "তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর।" (সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৩৩) (অর্থাৎ, বাইরে চাষবাস বা চাকুরী-ব্যবসার জন্য বের হয়ো না), তখন পিতা ও স্বামীর উপর তাদের ভরণ-পোষণ ফরয করলেন।

অতএব নারীর মূল কর্মক্ষেত্র তার গৃহাঙ্গন। অতি প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে কোন কাজে তাদের জন্য অনুমতি নেই। যেমন মূসা عليه السلام দুশমনের ভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে যখন মাদ্‌য়্যানের কূপের নিকট পৌঁছলেন তখন দেখলেন, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে, আর তাদের পশ্চাতে দু'জন যুবতী তাদের পশুগুলিকে আগলে আছে। হযরত মূসা عليه السلام বললেন, 'তোমাদের কি ব্যাপার?' ওরা বলল, 'রাখালেরা ওদের পশুগুলিকে নিয়ে সরে না গেলে আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি খাওয়াতে পারি না। আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।' (সূরা আল-ক্বাসাস (২৮) : ২৩)

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দুই কন্যা গৃহের বাইরে মাঠে পশুদেরকে পানি খাওয়াতে আসার ওজর ও প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে দিল। কারণ, তাদের অভিভাবক পিতা; যাঁর উপর তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আছে তিনি কাজে অক্ষম, অতি বৃদ্ধ। তারা যদি

ঘরের বাইরে এ কাজ না করতে আসে, তবে তাদের চলবে কি করে? কিন্তু এই ঘটনাতেই আরো কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। মূসা ﷺ ওদের হয়ে ওদের পশুগুলিকে পানি পান করালেন। মহিলা-দু'টি এ ঘটনা তাদের পিতার নিকট উল্লেখ করল। পিতা লোকটির (মূসার) উদারতা দেখে তাঁকে গৃহে আমন্ত্রিত করে পুরস্কৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন একজন যুবতী লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর নিকট এল এবং পিতার সে ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করল। মূসা ﷺ তাদের বাড়িতে গেলেন। পরিচয় হওয়ার পর একজন বলল, 'আব্বা আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন। কারণ, মজুর হিসাবে সেই ব্যক্তি উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত (আমানতদার)।' অতঃপর কন্যার পিতা আর এক ইচ্ছা পোষণ করে বললেন, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একজনের তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই।'

প্রথমতঃ লক্ষণীয় 'লজ্জাজড়িত-পদক্ষেপে' আসা। এখান হতে বুঝা যায় যে, নারী অতি প্রয়োজনে গৃহের বাইরে কাজে গেলেও সে তার নারীত্ব ও শরয়ী আদবের যথার্থ সুরক্ষা করবে।

দ্বিতীয়তঃ মজুর রাখার কথা। নারীর বাইরে গিয়ে কাজ করার বিকল্প ব্যবস্থা (সামর্থ্যবান হলে) মজুর রেখে নেওয়া অথবা বাইরের কাজ ভৃত্য ও রাখাল দ্বারা সম্পন্ন করা। কিন্তু মজুর ও ভৃত্য এমন হবে যে, তার যেন কাজে ক্ষমতা থাকে এবং ব্যবহারে আমানতদার ও বিশ্বস্ত হয়। টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য চারিত্রিক ব্যাপারে যেন আস্থাভাজন হয়।

তৃতীয়তঃ নারী যদি বিবাহের যোগ্য হয়, তবে তার বিবাহ দ্বারা একজন পুরুষকে আপন করা যায়। আর স্বাভাবিকভাবে তাদের বাইরের কাজকর্ম ও সকলের ভরণপোষণ তখন সেই স্বামীর দায়িত্বে এসে যায়। যাতে নারীত্ব, সতীত্ব, পবিত্রতা ও কৌলীন্যের কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

দু'টি বিশ্বযুদ্ধে যখন পুরুষের সংখ্যা কম হয়ে গেল, কাফেররা তখন পুরুষদের এ শূন্যপদ পূর্ণ করার জন্য নারীদেরকে বাইরের কাজে ভর্তি করতে লাগল। পরে পরেই ইহুদীদের হারেম থেকে আওয়াজ উঠল নারী-স্বাধীনতার; পুরুষের মত তাকেও সমান অধিকার দেওয়ার। উদ্দেশ্য নারীর নারীত্বকে ধ্বংস করে পূত-পবিত্র শৃঙ্খলময় মুসলিম সমাজের সর্বনাশ সাধন; নির্মল কাজল-জলা পুষ্করিণীর মত পরিবেশকে আলোড়িত করে স্বার্থ-মৎস্য ধরে খাওয়া। কিন্তু এই আওয়াজে তারা সাড়াও পেল ভালো। শুরু হল নারী-পুরুষ একাকার হয়ে একত্রে মিশে কাজ। যেমন স্বামীদের নিকট থেকে অত্যাচারিতা, অবহেলিতা ও পরিত্যক্তা হয়েও বহু নারী এই আন্দোলনে যোগ দিল। তাছাড়া এ স্বাধীনতায় স্বার্থবাদী পুরুষদেরও স্বার্থ ছিল; কর্মস্থলে নারীর সংসর্গ লাভ, ব্যবসাক্ষেত্রে যুবতী দ্বারা ক্রেতাদলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনোরঞ্জন তথা অধিক মুনাফা লাভ, তরুণীর দেহ ও উদ্গত যৌবন দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে অর্থোপার্জন ইত্যাদি। অতএব আসলে তাদের নারীর প্রতি আদৌ কোন দরদ ছিল না। যে দরদের অভিব্যক্তি ছিল তা হল, 'মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে শান্ত কল্পে বকে, ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি

দেখি সাপের চোখে!' তাই এই আন্দোলনে সমর্থন করল তারাই বেশী। কেউ বা সমর্থন করল নির্যাতিতার অভিভাবক বা আত্মীয় হওয়ার খাতিরে। যা পরবর্তীকালে নারী ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে শুরু হল উচ্ছৃঙ্খলতা, নগ্নতা ও বেলেল্লাপনা।

অবশ্য মুসলিম সমাজে সে প্রয়োজন, স্বার্থপরতা ও চাপ নেই। মুসলিম পুরুষ তার নারীদের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করে। তবুও নারী স্বাধীনতার আন্দোলন অনেক মুসলিম নামধারী সমাজ ও পরিবেশের নিকট সাদরে গৃহীত ও প্রশংসিত হয়েছে। ফলে তারাও কাফেরদের অসভ্যতার ছোঁয়ায় নারীদেরকে অর্ধনগ্নাবস্থায় সগর্বে পুরুষ-মহলে চাকুরী করতে পাঠাতে কোন কুণ্ঠা বা সংকোচ বোধ করে না।

কিন্তু প্রয়োজনের কদর করে মুসলিম সমাজ নারীদের জন্য বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে। যেহেতু নারীশিক্ষা, চিকিৎসা এবং বিভিন্ন নারীমহলের কাজের ক্ষেত্রে মহিলাকর্মীর প্রয়োজন আছে। তাই শরয়ী আদবের গণ্ডিতে তাদেরকে সেই সব কর্মভার ও চাকুরী প্রদান করা হয়ে থাকে এবং অপ্রয়োজনে নারীকে গৃহের কাজ, সন্তান পালন প্রভৃতি সাংসারিক দায়িত্ব দিয়ে 'সুখী সংসার' গড়ার উৎসাহ দিয়ে থাকে।

তাই এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাধারা এবং ধর্মহীন চিন্তাধারার মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ইসলামের মতে নারীদের আসল কর্মক্ষেত্র তার গৃহ। এবং বাইরের কর্ম তার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে; যেমন, যদি নারীর কোন তত্ত্বাবধায়ক না থাকে, বিধবা বা উপেক্ষিতা হলে যে সমাজে তার ভরণ-পোষণের জন্য ঐ পরিস্থিতিতে কোন বিকল্প ব্যবস্থা (যাকাত ফাণ্ড, বায়তুল মাল) না থাকে, তবে নারীকেই তার নিজের ও সন্তানের ভরণ-পোষণ সংগ্রহ করতে বের হতেই হয়। সে ক্ষেত্রে যে কাজে ফিতনা কম সেটাই গ্রহণ করা নারীর জন্য ওয়াজেব হবে। যাতে তার সতীত্ব, নারীত্ব ও ধর্ম হারিয়ে না যায়।

কিন্তু ধর্মহীন চিন্তাধারা এর বিপরীত; পুরুষের মত স্বাধীনতা ও সকল কাজে অংশ নেওয়া নারীদের এক পার্থিব অধিকার। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, অভাবে-বিলাসে তার উপযুক্ত অথবা অনুপযুক্ত চাকুরীতে ও অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে বিনা কোন সামাজিক বাধায় তারা যাবে আসবে। এই বল্গাহীন পাশ্চাত্য সভ্যতায় শুরু হয়েছে বড় ফিতনা।

গৃহের বাইরে নারীদের (মাহারেম বা স্বামী ছাড়া) কোন কাজে যে বহুমূখী অসুবিধা, বিঘ্ন ও বিপত্তি আছে তা কমবেশী সকলের নিকটই স্বীকার্য। তবে অনেকে সে বিঘ্ন ও বিপত্তিকে কিছু মনেই করে না। বরং তা অধুনা যুগের এক ফ্যাশন এবং দাবী বলে মনে করে। আর যারা এই পবিত্রতা, সতীত্ব ও নারীত্বকে বহাল রাখতে চায় তাদেরকে 'মৌলবাদী, রক্ষণশীল বা প্রাচীনপন্থী' বলে নাক সিটকায়। অথচ এর ফলে এই আধুনিক যুগের অভিনব প্রগতিশীল (?) পরিবেশে যে বিঘ্ন ও ফিতনা ঘটে তার একটি মোটামুটি সমীক্ষা নিম্নরূপ ঃ-

১- পুরুষ মহলে নারীদের কর্মে ধর্মীয় অনুদেশ ও নির্দেশের বিরোধিতা হয়; যেমন, পুরুষের সাথে অবাধ মিলামিশা, আপোষে পরিচয়, বন্ধুত্ব ও অবৈধ নির্জনতাবলম্বন, সুগন্ধি ব্যবহার করে সহকর্মীর হৃদয় আকর্ষণ, নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ এবং অদূর ভবিষ্যতে অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচারও।

২- স্বামীর প্রতি অনীহা প্রকাশ, (যে নিজের কামাই-এ খেতে পারে সে অপরের কাছে পরাধীনতা ও পরবশ্যতা কেন স্বীকার করবে?) সন্তান, স্বামী ও তার আত্মীয়র অধিকার ক্ষুণ্ন, গৃহস্থালী কর্ম ব্যাহত। সন্তান লালন-পালন ও তাদেরকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলার কাজে অনবধানতা। ফলে ছেলে-মেয়েদের জীবন (চরিত্রগত দিক থেকে) ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

৩- নারীর অন্তরে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও গুরুত্ব কম পড়ে যায় এবং তার উপর স্বামীর কর্তৃত্ব আছে সে কথাও ভুলে যায়। যেমন যে মহিলার উপাধিপত্র তার স্বামীর সমতুল অথবা তার চেয়ে উচ্চতর, অথবা যে স্বামীর চেয়ে অধিক বেতনে চাকুরী করে, সে মহিলার মনে কি স্বামীর পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা ও তার আনুগত্য দরকারী বলে অনুভব করবে? অথবা সে আত্মনির্ভরতায় গর্বিতা হয়ে দাম্পত্য কলহের মূল কারণ হবে? (অবশ্য পতিব্রতা নারীর জন্য এরূপ সম্ভব নয়। তবে এ সময় তার ব্রত বিব্রত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিশ্চয় থাকে।

৪- কর্ম নারীর পক্ষে শারীরিক বিঘ্ন এবং মানসিক চাপের হেতু হয়; যা তার প্রকৃতিরও অনুকূল নয়।

অবশ্য এ বিষয়ে আল্লাহভীতি রাখা, শরীয়তের মানদণ্ডে এ সমস্যাকে তৌল করা, কোন্ ক্ষেত্রে নারীর চাকুরী বৈধাবৈধ হবে তার বিচার করা মুসলিম পরিবারের উচিত।

পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের জন্য অর্থ সংগ্রহের খাতিরে সৎ ও পবিত্র পথ ত্যাগ করা মুসলিম নারীর জন্য অবশ্যই বৈধ নয়। যেহেতু মানুষের মন মন্দকর্ম প্রবণ, প্রবৃত্তি অবাধ্য এবং শয়তান অশ্লীলতা ও নোংরামীর প্রতি প্রলুব্ধকারী।

গৃহের রহস্যগুপ্তি

পরিবারের যে কয়টি সদস্য থাকে তাদের আপোষের বহু বিষয় গোপনীয় হয়, যা বাইরে প্রকাশিত হলে বাড়ির ক্ষতি অথবা কারো অপমান বা লাঞ্ছনার আশঙ্কা থাকে। গৃহের শান্ত পরিবেশে বিঘ্ন আসে। কিন্তু ইসলাম সুষ্ট পরিবেশ গঠনে বড় যত্নবান।

স্বামী-স্ত্রী তাদের সম্ভোগ-রহস্য কোন বন্ধু বা সখীর নিকট প্রকাশ করবে না। অপরের নিকট কেউ কারো রসোদ্গার করবে না। অনুরূপভাবে এক অপরের কোন গুপ্ত রহস্য, যৌন-সমস্যা বা যৌন দুর্বলতা এবং গুপ্ত সৌন্দর্যাদিও কারো নিকট প্রকাশ করবে না।

এ বিষয়ে আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে স্ত্রী-সহবাস করে এবং স্ত্রী স্বামী-সহবাস করে, অতঃপর স্ত্রীর (সৌন্দর্য ও রতি) রহস্য (অপরের নিকট প্রকাশ ও) প্রচার করে।" (মুসলিম)

এমন স্বামী যে তার স্ত্রী-সম্ভোগের কাহিনী অপরের কাছে বলে (আনন্দ পেয়ে) থাকে এবং এমন স্ত্রী যে স্বামী-সম্ভোগের বৃত্তান্ত অপরের কাছে বলে (মজা নিয়ে) থাকে তেমন স্বামী-স্ত্রীর জন্য নবী ﷺ উদাহরণ দেন এমন এক শয়তানের, যে কোন শয়তানীকে রাস্তায় পেলে তার সাথে প্রকাশ্যে রমণ করে অথচ লোক তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে থাকে। (আহমাদ ৬/৪৫৭, আবূ দাউদ)

যেমন স্বামীর উচিত, কোন পুরুষের স্বাস্থ্য ও রূপ তার স্ত্রীর নিকট বর্ণনা না করা। আর স্ত্রীরও উচিত, কোন নারীর দেহ-সৌন্দর্য ও লাবণ্যাদি স্বামীর নিকট বর্ণনা না করা। যেমন তার উচিত, এমন কোন নারীকে (বিশেষ করে কাফের নারীকে) তার গুপ্ত সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা; যে তার সেই সৌন্দর্যের কথা তার স্বামী বা প্রণয়ীর নিকট গিয়ে প্রকাশ করে এবং সে শুনে কল্পনার ছবিতে তা দর্শন করে থাকে।

এমন অলঙ্কার না পরা; যাতে বাজনা হয়, অথবা শব্দবিশিষ্ট অলঙ্কার পরে এমন সজোরে পদক্ষেপ না করা; যাতে তাদের গোপন আভরণের শব্দে কোন পুরুষের রোগা হৃদয়ে কুবাসনা জাগ্রত হয়। (সূরা আন-নূর (২৪) : ৩১)

অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রীর আপোষ কলহ গৃহসীমার বাইরে যাওয়া উচিত নয়। যেমন, পরিবারের কোন প্রকারের গোপনীয় তত্ত্ব বাইরে প্রকাশ হওয়া অনুচিত; যার কিছু কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

পরিবারের কোন সদস্যের (ভাই, বোন বা অন্য কারোর) এ উচিত নয় যে, বাড়ির কোন যুবতীর (বোন অথবা ভাবীর) রূপচর্চা অপরের নিকট করে। কারণ, এতে অনুৎসুক হৃদয়েও দর্শনের বাসনা জাগে। অথচ এমনভাবে খাল কেটে কুমীর বা ডেকে বিপদ আনা কোন মুসলিমের কাজ নয়।

গৃহে সদাচার

শক্তিতে নয়, ভক্তিতে মানুষের মন জয় করতে হয়। ভক্তি পরিবারের জন্য আল্লাহর এক রহমত। যে গৃহের চরিত্রবান সদস্যদের মাঝে কোমলতা ও নম্রতা থাকে, এক অপরের প্রতি সমীহ ও ভক্তি থাকে, সে গৃহের পরিবেশ সত্যই অনুপম।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন পরিবারকে ভালোবাসেন, অথবা তার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তখন সেই পরিবারের মাঝে কোমলতা প্রবিষ্ট করেন।" (আহমাদ ৬/৭১, সহীহুল জামে ৩০৩, ১৭০৪নং)

যাতে তাদের এক অপরকে কোমলতা ও নম্রতা প্রদর্শন করে। ভাই ভাইকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং পিতা-মাতা সন্তানদেরকে প্রতিনিয়ত কোমল আচরণ ও ব্যবহারের

মাধ্যমে নির্দেশ, শাসন বা সংশোধন করে থাকে। তাতে সংসার হয় সুখের এবং পরিবেশ হয় বেহেশতের। আর তাতে যে সুফল ও সুন্দর পরিণাম হয় তা কঠিনতায় বা ডাঁট-ধমকে হয় না। যেমন আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ কোমলতা পছন্দ করেন। আর কোমলতায় তিনি যে (সুফল) প্রদান করেন, তা কঠিনতায় বা অন্যান্যতে প্রদান করেন না।” (মুসলিম)

তবে কোমলতা ও নম্রতা প্রদর্শনের অর্থ কিন্তু দুর্বলতা প্রকাশ নয়।

গৃহে সদাচারের মধ্যে গৃহস্বামী বা অন্য সদস্যের পরিবারের কাজে সহায়তা করাও এক উত্তম কাজ। অনেক মানুষ আছে, যারা কোন সাংসারিক (বিশেষ করে মহিলাদের) কাজে সহযোগিতা করতে চায় না। অনেকে মহিলাদের (মা বা স্ত্রীর) কাজে সাহায্য করাটাকে নিন্দনীয় ও মানহানির ব্যাপার মনে করে। অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ যিনি দুই জগতের সর্দার, তিনি নিজ বস্ত্র স্বহস্তে সেলাই করতেন, নিজ জুতা পরিষ্কার করতেন এবং পুরুষেরা গৃহে যে কাজ করে থাকে---সেই কাজ তিনিও করতেন। (আহমাদ ৬/১২১)

তিনি একজন মানুষ ছিলেন। নিজ কাপড় পরিষ্কার করতেন। ছাগলের দুধ দোহন করতেন এবং আত্মসেবা নিজেই করতেন। (আহমাদ ৬/২৫৬)

পত্নীদের কাজে সহায়তা করতেন। অতঃপর নামাযের সময় হলে মসজিদে হাজির হতেন। (বুখারী ২/১৬২)

আমরাও যদি এরূপ করতে পারি তাহলে আমাদেরও কত মঙ্গল হয়। তাতে মহানবীর অনুকরণ করা হয়, পরিবারকে সহায়তা করলে তাদের নিকট আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়ে, আত্মগর্ব ও দাম্ভিকতা ছেড়ে নম্রতা ও কোমলতা প্রদর্শন করতে পারি। তবে গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করা অবশ্যই উচিত নয়।

কিছু গৃহস্বামী আছে, যারা বাড়িতে পা রেখেই চট্ করে খাবার চায়। যখন হাঁড়ি থাকে উননের উপর। গৃহিণীর কোলে থাকে শিশু; যে দুধ পান করার জন্য চিৎকার করে। অথচ তারা না ছেলেটিকে ধরে, আর না-ই খাবারের জন্য একটু সবর করে। উপরন্তু স্ত্রীর উপর রাঙা চক্ষু অথবা তপ্ত জিহ্বাতে ঝাল ঝাড়ে! এমন স্বামীদের উচিত মহা নবী ﷺ-এর অনুকরণ করা।

অপরদিকে এমনও স্বামী (?) আছে, যে সাংসারিক কাজের জন্য প্রায়শ স্ত্রীর কাছে বকুনি খায়! আর যার স্ত্রী মোড়ল, তার জীবন বেকার। সে না পুরুষ, না স্ত্রী। সে কিছুই নয়।

মোটকথা, গৃহস্বামিনী সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। কেউ বা গৃহস্বামীর জন্য দাসী, কেউ বা প্রভু, কেউ বা বন্ধু। স্ত্রীর দাসত্বে অথবা প্রভুত্বে সংসার শান্তির হয় না। অবশ্য বন্ধুত্বে সোনার দাম্পত্য গড়ে ওঠে। যেহেতু–

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...}

“নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে; যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে---।” (সূরা আল-বাক্বারা (২) : ২২৮) তাই স্ত্রীর হৃদয়ে স্বামীর মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও কর্তৃত্ব সদা লুক্কায়িত থাকে।

গৃহকে প্রেম, ভালোবাসা ও আনন্দনীরে পরিপ্লুত করার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রণয়াচরণ একান্ত জরুরী। গাম্ভীর্যের মাঝে অনুরাগের বিকাশ মনের আকাশে ছোঁয়া দেয় বড়। সুখী সংসারের (পিতা-মাতার পর) একমাত্র সুখের সম্বল তো দাম্পত্য প্রেম। তারই জন্য “যে স্ত্রীর নিকট ভালো, সে সকলের নিকট ভালো।”

অনন্ত দাম্পত্য সুখ লাভের জন্য চরিত্রবান পুরুষ ও চরিত্রবতী নারীর বিবাহবন্ধন চাই। যাদের প্রীতির বিনিময় হবে প্রীতির ফুলবর্ষণ। ধর্মের বাঁধনে যাদের জীবনে প্রেমের খেলাও মধুময় হয়ে থাকে।

এমন দাম্পত্য জীবন গড়ার জন্যই মহানবী ﷺ হযরত জাবের (রাঃ)-কে কুমারী নারী বিবাহ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, (অকুমারী বিবাহ করেছ?) “কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে প্রেমখেলা খেলতে, সে তোমার সঙ্গে খেলত। তুমি তাকে হাসাতে, সে তোমাকে হাসাত।” (বুখারী ৯/১২১) কারণ, অকুমারী স্ত্রী হাসিখেলিতে ততটা সঙ্গ দিতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, “প্রতি কাজ (খেলা) যাতে আল্লাহর যিকির, (ধর্মীয় উদ্দেশ্য, শারীরিক উপকার) থাকে না, তাই (অসার) ক্রীড়া-কৌতুক, চারটি খেলা ছাড়া। তার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমখেলা (প্রমোদকৌতুক ও রসিকতাদি) অন্যতম।” (নাসাঈ, সহীহুল জামে ৪৫৩৪নং)

মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবনে অনাবিল দাম্পত্য সুখ এবং পত্নীদের সাথে কৌতুকাদি পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, তিনি ছোট শিশুদের সাথেও হাস্য-কৌতুক করতেন, তাদেরকে চুম্বন দিতেন। তাঁর জীবন তো দয়া, স্নেহ ও প্রেম দিয়ে মোড়া ছিল। “তিনি বিশ্বজগতের প্রতি কেবল আশিস্‌রূপেই প্রেরিত হয়েছিলেন।” (সূরা আল-আম্বিয়া (২১) : ১০৭)

এমন কোন পরিবার নেই যেথায় কোন না কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী (পরনিন্দা, পরচর্চা), মুখখিস্তি প্রভৃতির কিছু না কিছু কারো না কারো দ্বারা হয়েই থাকে। গৃহস্বামী বা গৃহিণীকে এই মন্দস্বভাবের প্রতিকার ও দমনের ব্যবস্থা খুবই সতর্কতা ও প্রযত্নের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

অনেকের মতে প্রতিকারে দৈহিক শাস্তিই একমাত্র ঔষধ। কিন্তু আল্লাহর নবী ﷺ পরিবারের কারো নিকট হতে কোন মিথ্যার কথা জানতে পারলে তাকে উপেক্ষা করতেন; যতক্ষণ না সে তওবা ও অনুশোচনা করেছে। (আহমাদ ৬/১৫২)

অতএব বাক্যালাপ ও যত্নাদর প্রভৃতিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করাই এ রোগের প্রতিষেধক ঔষধ এবং এ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি। যা প্রহারাদি অপেক্ষা অধিক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবশীল।

অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রহারও ফলপ্রসূ হতে পারে। তবে প্রহার না করে প্রহারের ভয় প্রদর্শনও ফলদায়ক। যার জন্য মহানবী ﷺ পরিবারের দৃষ্টি সম্মুখে গৃহে চাবুক লটকিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সিলসিলা সহীহা ১৪৪৭নং)

যাতে তা প্রত্যক্ষ করে কেউ অসঙ্গত ব্যবহার করার ইচ্ছা করলেও যেন শঙ্কিত হয় এবং তা পরিহার করে আচরণ ও ব্যবহারে (বড়র) বাধ্য হতে অভ্যস্ত হয়।

আবার প্রহারই মূল বা প্রথম প্রতিকার নয়। বরং কোন আনুগত্য বা আদবের উপর অন্যান্য অসীলা ও মাধ্যম ব্যবহার করার পরও যদি অভীষ্ট লাভ না হয়, তবে তা ব্যবহার করা যায়। যেমন স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে প্রথমতঃ সদুপদেশ, অতঃপর তার শয্যাত্যাগ অতঃপর প্রহার ব্যবহার করা শরীয়ত-সম্মত। অনুরূপভাবে সপ্তমবর্ষীয় ছেলেকে নামাযের আদেশ দিয়ে যদি দশম বছরেও নামাযী না হয়, তবে তার উপর তাকে প্রহার করার নির্দেশ শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু মাঝের তিন বছরে অন্যান্য ব্যবস্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করে বিনা প্রহারে নামাযে অভ্যস্ত করানো উচিত।

অতএব অপ্রয়োজনে প্রথমে অথবা সামান্য বিষয়েই মার-পিট করা অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন। তাই মহানবী ﷺ একজন মহিলাকে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সে অমুক ব্যক্তিকে যেন বিবাহ না করে। কারণ, সে কাঁধ হতে লাঠি নামায় না; অর্থাৎ সে নারীর পক্ষে বড় মারহাতা।

পক্ষান্তরে যারা কিছু কুফরী তরবিয়তী মতবাদের অনুকরণে মূলেই প্রহার ব্যবহার করা অন্যায় মনে করে, তাদের রায় সঠিক নয় এবং তা ইসলামী সংবিধানের পরিপন্থী।

গৃহে অপকর্ম

বেগানা আত্মীয়ের গৃহ প্রবেশ

ইসলাম আত্মীয়তা ও জ্ঞাতি-বন্ধন সুদৃঢ় রাখতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। নিকটাত্মীয়দের সাথে আপোসে যোগাযোগ বজায় রাখতে, তাদের অধিকার প্রদান করতে তাদের সাথে প্রীতি ও সহানুভূতিশীল সদ্ব্যবহার রাখতে এবং বিপদ-আপদে ও অভাব-অভিযোগে বিশেষ সাহায্য করতে উৎসাহিত করে। আত্মীয় স্বীয় আত্মীয়র সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-সালাপ ও যাওয়া-আসার মাধ্যমে ঘনিষ্টতা সাধন করবে---এটাই মানুষের প্রকৃতি ও ধর্মীয় কর্তব্য। তবে এসব কিছুর মাঝে শরয়ী নিয়ন্ত্রণ-সীমা ও কিছু বাধ্য-বাধকতা আছে। কোন আত্মীয় তার আত্মীয়র জন্য কোন বিষয়ে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা অনাত্মীয়র উপর তাকে অন্যায় প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দান করতে পারবে না। আত্মীয় কোন বেগানা (গম্য) স্ত্রী-লোক হলে তার সাথে অবাধে সাক্ষাৎ, মিলামিশা, নির্জনে অবস্থান, কথোপকথন বা ভ্রমণ ইত্যাদি তার জন্য অবৈধ হবে। বিনা পর্দায় সেই গম্যা মহিলা এ আত্মীয়র খিদমত করতে পারবে না। অবশ্য অগম্যা (মাহরাম বা এগানা)দের ক্ষেত্রে এসব বাধাবিঘ্ন নেই।

প্রায় প্রতি গৃহেই গৃহস্বামীর গায়ের মাহারেম (বিশেষতঃ স্বামীর) আত্মীয়-স্বজন থাকে। যারা একত্রে একই গৃহে বসবাস করে; যেমন দেবর ইত্যাদি। বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলেই নিঃসংকোচ ও নির্দ্বিধায় গৃহে প্রবেশ করে। কতক লোক যারা গৃহস্বামীর আত্মীয় বলে প্রতিবেশীর সকলের নিকট পরিচিত। কেউ চাচা বা চাচাতো ভাই, কেউ মামা বা মামাতো ভাই ইত্যাদি। যারা বিনা অনুমতি ও দ্বিধায় গৃহস্বামীর উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতিতে বাড়িতে আসে যায়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সহজসাধ্য প্রবেশ যে বহু ক্ষেত্রে বড় বিঘ্ন সৃষ্টি করে---তা অনেক ভুক্তভোগীই জানে।

অপরদিকে শরীয়তী সীমা উল্লঙ্ঘন করা হয় এ বিষয়কে কোন গুরুত্ব না দিয়ে। এ বিষয়ে আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "খবরদার! তোমরা (গায়ের মাহারেম) নারীদের নিকট যাতায়াত করো না।" আনসারের এক ব্যক্তি বলল, (স্বামীর আত্মীয়) দেবর[4] সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? (সেও কি ভাবীর নিকট যাতায়াত করতে পাবে না?) তিনি বললেন, "দেবর তো মৃত্যু-স্বরূপ!" (বুখারী ৯/৩৩০)

ইমাম নওবী (রঃ) বলেন, 'এই হাদীসে (الحمو) বলতে স্বামীর পিতা ও পুত্র ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, শ্বশুর ও সৎ ছেলে স্ত্রীর জন্য মাহারেম; যাদের সাথে তার নির্জনতা বৈধ এবং তাদের আপোসে পর্দা নেই। যাদেরকে 'মৃত্যু' বলে অভিহিত করা যায় না। তাই এখানে স্বামীর ভাই, ভাইপো, চাচা, চাচাতো ভাই, মামা, মামাতো ভাই, খালু, খালাতো ভাই, ফুফা, ফুফাতো ভাই, বুনুই, বুনপো প্রভৃতি---যাদের সাথে এ স্ত্রীর (তালাক হলে অথবা স্বামী মারা গেলে) বিবাহ বৈধ---তারাই উদ্দিষ্ট। যেহেতু সাধারণতঃ ভাবী দেওরের সাথে অধিক নির্জনতাবলম্বন করে থাকে। তাই তাকে স্ত্রীর জন্য মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। (ফতহুল বারী ৯/৩৩১)

কিন্তু কেন তাকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হল? এর কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে।

যেহেতু দেবরের সাথে ভাবীর নির্জনতায় পাপ ঘটলে তাদের দ্বীনের মৃত্যুর কথা ভাবা যায়। অথবা এ নির্জনতা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়; যখন ব্যভিচারে ধরা পড়ে এবং রজমের হদ্দ কায়েম করা হয়। অথবা স্ত্রীকে ধ্বংসের মুখে পতিত করে; যদি এ ব্যাপার স্বামীর নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তাকে তালাক দেয়।

অথবা ভাবী দেওরের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা হতে এমন ভয় করবে; যেমন সে মৃত্যুকে ভয় করে। অথবা এরূপ নির্জনতা মৃত্যুর মত অপ্রীতিকর। অথবা ভাবী মরে যায় সেও ভালো, তবুও যেন দেওরের সাথে নিভৃততা অবলম্বন না করে।

এ সবকিছুই পরিবার ও পরিবেশকে নির্মল ও পবিত্র রাখার জন্য শরীয়তের সুন্দরতম ব্যবস্থা এবং যাতে পরিবারে কোন প্রকারের মলিনতা, আবর্জনা বা ক্ষতি না আসে তার একান্ত প্রচেষ্টা।

[4] জ্ঞাতব্য যে, কোন মুসলিম মহিলা তার স্বামীর ভাইকে 'আমার দেওর বা দেবর' বলতে পারে না। কারণ, দেওর বা দেবর মানে হল দ্বিতীয় বর। যেমন ভাবী-দেওর পরস্পর উপহাসের পাত্র-পাত্রীও নয়।

অতএব রসূল ﷺ-এর এ বিবৃতির পর এমন স্বামীকে কি বলা যায়, যে তার স্ত্রীকে বলে, আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাই-বন্ধু কেউ এলে তার যথার্থ খাতির করবে। অথবা যে তার কোন আত্মীয় বাড়িতে এসে চা পান না করে ফিরে গেলে স্ত্রীকে ধমক দিয়ে থাকে। অথবা যার স্ত্রী নিজে থেকেই তাদের খিদমতে জান-মন বিলিয়ে থাকে। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তার সাথে এবং এর সাথে অন্য কেউ সঙ্গী থাকে না?!

অনেকে বলে থাকে যে, 'আমি আমার স্ত্রীকে জানি, তার উপর আমার বিশ্বাস আছে। এ ধরনের কোন অঘটন সে ঘটাতেই পারে না, আমি আমার ভায়ের উপর পূর্ণ আস্থা রাখি, আমার বন্ধু তেমন নয়, আমার চাচাতো বা মামাতো ভাই খুবই ভালো, এ সব ব্যাপারে ওদের মনও কিছু গায় না।' তাদের জন্য এই বলা যায় যে, 'যাকে বিশ্বাস কর তাকে অবিশ্বাস করো না, যাকে ভালো ও নিষ্পাপ মনে কর, তার প্রতি সন্দেহ করো না। তবুও জ্ঞানীর উচিত, চিকিৎসার পূর্বে রোগ হতে নিজেকে দূরে রাখা, রোগের জীবাণু হতে সাবধান ও সতর্ক থাকা। বরং সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহর রসূলের নির্দেশের উপর আমল করা। তাঁর বাণী "কোন নারীর সাথে নির্জনতাবলম্বন করলেই শয়তান তাদের তৃতীয় হয় (এবং তাদের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে পাপে উদ্বুদ্ধ করে।)" (তিরমিযী ১১৭১নং) স্মরণে রেখে এ ব্যাপারে তাঁর অনুগত হওয়া। যাতে শ্রেষ্ঠতম মুত্তাকী এবং নিকৃষ্টতম লম্পটকেও বুঝানো হয়েছে। মুত্তাকী বা চরিত্রবান হলেই কোন বেগানা নারীর সাথে নির্জনতাবলম্বন তার জন্য বৈধ হবে একথা শরীতের উদ্দেশ্য নয়। অথবা কলঙ্ক বা দুর্নামের ভয় না থাকলেই স্ত্রী-কন্যাকে সকলের সাথে সাক্ষাৎ করতে, কথা বলতে, হাসতে দেওয়া যাবে---তাও নয়।

দুঃখের বিষয় যে, আমাদের পরিবেশে তথাকথিত মুরুব্বী পুরুষ বা মহিলারা যদি ছেলেকে পিতা-মাতা বা কোন আত্মীয়র সামনে তার স্ত্রীর সাথে উপহাস করতে বা হাসাহাসি করতে দেখে, তাহলে তারা যেন লজ্জায় ছিঃ ছিঃ করে, 'ঢেটা' বলে নাক তরে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, 'উয়া আবার কি? কথায় বলে দিনের ভাসুর, রাতের পুরুষ। এ কালের ছেলেদের হায়া-শরম কিছু নাই' ইত্যাদি। অথচ এ মানুষই ভাবী-দেওরের বা শালী-বুনুই-এর আপোসের হাসাহাসি দেখতে লজ্জা পায় না। বরং তাতে উৎসাহিত করে থাকে। বলে, 'ভাবী-দেওর বা শালী-বুনুই-এর ব্যাপার, মজাক তো হবেই!' প্রকৃতপক্ষে এদেরকে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের 'কুটনী' বলা যায়।

কুটুম্বিতায় নারী-পুরুষকে পৃথকীকরণ

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক হয়। তার জন্য তার আত্মীয়-বন্ধু নিশ্চিতভাবে কেউ না কেউ থেকেই থাকে এবং তাদের আপোসে সাক্ষাৎ যাতায়াত ও কুটুম্বিতা হয়েই থাকে।

কিন্তু পারিবারিক সাক্ষাতের সময় (গায়র মাহারেমদের আপোষে) অবাধ মিলামিশার সুযোগ না দিয়ে মন্দের দরজা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা একান্ত জরুরী। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"---এবং ওদের (নারীদের) নিকট কোন উপকরণ চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।" (সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৫৩)

অন্যথা যদি আমরা পারিবারিক কুটুম্বিতায় অবাধ মিলামিশার মন্দ প্রভাব সমীক্ষা করে দেখি, তাহলে একাধিক ক্ষতি আমাদের নজরে আসবে ঃ-

১- অধিকাংশ মহিলাই কুটুম বাড়িতে গিয়ে পর্দার খেয়াল রাখে না। ফলে তারা তাদের নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে, যাদের নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ নিষেধ করেছেন। (সূরা আন-নূর (২৪) : ৩১)

উপরন্তু সাধারণতঃ কুটুম বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মহিলাদের মাঝে যে সাজসজ্জা, রূপচর্চা ও প্রসাধনের প্রবণতা দেখা যায়, যার অর্ধেকও স্বগৃহে স্বামীর জন্য করতে আগ্রহী হয় না। ফলে হিতে বিপরীত হয়ে অনেক সময় নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনে।

উল্লেখ্য যে, শরীয়ত মুসলিম নারীর ক্ষেত্রে (পর্দা) লেবাসের ৮টি শর্ত আরোপ করেছে (বিশেষ করে যখন বাইরে যাবে, তখন এ শর্তগুলি অবশ্য পালনীয়)ঃ-

(১) লেবাস যেন সারা দেহ আচ্ছাদিত করে।

(২) তা যেন সৌন্দর্যময় ও দৃষ্টি-আকর্ষী না হয়।

(৩) এমন পাতলা না হয়, যাতে ভিতরের চামড়া নজরে আসে।

(৪) এমন আঁট-সাঁট না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ব্যক্ত করে।

(৫) যেন সুগন্ধিত না হয়।

(৬) কাফের নারীদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।

(৭) পুরুষদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।

(৮) তা যেন প্রসিদ্ধি-ব্যঞ্জক না হয়।

২- একই গৃহে একই স্থানে কুটুম্ব নারী-পুরুষের বৈঠক, পানাহার ও কথাবার্তা ইত্যাদিতে দ্বীনী ও চারিত্রিক বিঘ্ন ও ফাসাদ এবং কখনো বা অবৈধ প্রণয়ের জাল বিস্তার হয়।

৩- দাম্পত্যে মনোমালিন্য ও কলহ সৃষ্টি হয়ে প্রেমের মহলে চির ধরে। যখন এ ওর কন্যা বা স্ত্রীর প্রতি আসক্তির ভাব প্রকাশে ইঙ্গিতে কথা বলে, চোখাচোখি, হাসাহাসি, মাখামাখি ইত্যাদি করে এক অপরের দেখে যখন বাড়ি ফিরে, তখন হিসাব-নিকাশ শুরু হয় ঃ-

স্বামী ঃ অমুকের কথায় কথায় তুমি হাসছিলে কেন? অথচ ওর কোন কথাই হাস্যকর ছিল না?

স্ত্রী ঃ আর তুমি কেন অমুককে ইশারা করছিলে?

স্বামী ঃ ও যখন কথা বলছিল, তখন চট্ করে বুঝছিলে অথচ আমার কথা তোমার বুঝেই আসে না কেন?

স্ত্রী ঃ তুমি ওর মত বলতেই পার না----

এভাবে এক অপরকে অপবাদ ও দোষারোপ করে কলহের মাধ্যমে কখনো কখনো মতভেদ ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব তালাকের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৪- এই মিলা-মিশাতে অনেকে নিজের দাম্পত্যভাগ্য বিচার করার সুযোগ লাভ করে। স্বামী যখন পরস্ত্রীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে তার বিভিন্ন চরিত্র ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়; যে ব্যবহার সে তার স্ত্রীর নিকট পেতে আশা করে। অথচ তা সর্বদা বা একেবারেই পায় না। ফলে নিজের স্ত্রীকে ঐ পরস্ত্রীর সাথে তুলনা করে। অনুরূপভাবে স্ত্রীও যখন পরপুরুষের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয় এবং নিজ স্বামীর সাথে তাকে তুলনা করে, তখন শুরু হয় মানসিক তুফান। স্বামী মনে মনে বলে, 'গোলাপী কত ভালো মেয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, হাসিমুখে, মিষ্টিমুখে মিষ্টি মিষ্টি সুন্দর কথা বলে, সভ্যতার ছোঁয়া লাগা আধুনিকা স্মার্ট মেয়ে। অথচ আমার স্ত্রী একেবারে নোংরা, মুখে যেন হাসিই নেই। একেবারে গেঁয়ো, অসভ্য, জাহেল!' ইত্যাদি।

আর ঐ স্ত্রীও মনে মনে বলে, 'নসীবার কি নসীব! ওর স্বামী কি স্মার্ট, সভ্য ও মধুরভাষী, ওর ব্যবহারও বড় সুন্দর, আর আমার এক কপাল! আমার স্বামী সভ্যতা জানেই না, মোটা মোটা কথায় খোঁচা লাগে সদাই। যার কথার কোন ওজনই নেই, বলনে কোন মধুরতা নেই, ব্যবহারে যেন ভালোবাসাই নেই--' ইত্যাদি। আর এইভাবে দাম্পত্যে কলহ ও অশান্তি সৃষ্টি হয়।

৫- যাদের অলঙ্কারাদি নেই তারাও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য অপরের নিকট হতে অলঙ্কার ও লেবাসাদি ধার করেও কুটুম বাড়িতে 'মশান' দেখানোর চেষ্টা করে এবং কারো নিকট দুলের কথা শুনলে তাকে ইঙ্গিতে নিজের আঙ্গুলের অঙ্গুরীও দেখিয়ে দেয়। অথচ যার যা নেই অথবা যাকে যা দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে পরিতৃপ্তি প্রকাশক ব্যক্তি দুই অলীক বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তির মত। (বুখারী ৯/৩১৭)

৬- এই ধরনের কুটুম্বিতার তপ্ত মজলিসে বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে থাকে, মুখের নানা আপদে নানান পাপ হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যে বা চিৎকারে মজলিসের মাধুর্য নষ্ট করবে অথবা অসুন্দর বলে ছোট শিশুদেরকেও ঘরে রেখে আসা হয়।

এ ছাড়া আরো কত রকম 'কু'-এর জন্ম হয় এ ধরনের বৈঠকে; যা সাধারণতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার কুফরী পরিবেশের ছোঁয়াচ লাগা গৃহে হয়ে থাকে--তা বলাই বাহুল্য।

অথচ আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যাবলম্বন করবে সে তাদেরই দলভুক্ত।" (আহমাদ ২/৫০)

অতএব গৃহকর্তা যদি আল্লাহর অনুদেশ পালন করে চলে, তবে কোন বিঘ্নই থাকে না। বিশেষ করে কারো বিবাহ বা মৃত্যুর সময় উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে বিশেষ করে (কিশোরী ও যুবতী) নারীদেরকে পাঠানো উচিত নয়। যেমন দেশাচার ও লৌকিকতার নামে গৃহে মহিলাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে এবং তারা সে সময় কি করছে, নাচ-গান, কাপ, অশ্লীলতা ও বেগানা নারী-পুরুষের ক্ষীর বা আইবড় ভাত (?) খাওয়ানোর মাধ্যমে বাড়িতে কি অবৈধাচার চলছে তা চোখ-কান না করা গৃহকর্তার এক ধর্মীয় কর্তব্যে অবহেলা। তদনুরূপ কোন আত্মীয়র মৃত্যুকালে নিজে না গিয়ে (স্ত্রীর মাহারেম বা আপন কেউ না হলেও) স্ত্রীকে পাঠানো কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পুরুষ গেলে জানাযা পড়বে, দুআ করবে এবং মরা ঘরের বিভিন্ন সহযোগিতা করবে। কিন্তু নারী তো অবৈধ মায়াকান্না, পরচর্চা, ও পর্দাহীনতার পাপ ছাড়া কিছু লাভ করবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ পরিবার ও পরিবেশ বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত। তাই তো তাদের ছেলে-মেয়েদের আপোসের অবাধ মিলামিশাকে কিছু মনেই করে না। বাবা বলে, 'আমার ভাইপো-বোনপো আমার বাড়ি আসবে।' মা বলে, 'আমার ভাইপো-বোনপো আমার নিকট আসবে তাদেরকে রুখা যাবে কিভাবে?' তাই এ পরিবেশে অন্ধতা অথবা অবজ্ঞা আসার ফলে নিজেদের কন্যাদের সাথে তাদের এ ভাইপো-বোনপোদের অবাধ মিলামিশা, হাসি-তামাশা প্রভৃতি রঙ্গরস চলতে থাকে। এতে তারা 'বোন-বোন' বলতে বলতে শেষে যে বোনের কি সর্বনাশ ঘটায়, তা হয়তো বোনেরা লজ্জায় গোপন করে নেয়। ফলে মনে করা হয়, তারা খুব ভাল! প্রকাশ পেলেও তা না শোনা ও না জানার ভান করে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বহু পরিবেশে ইচ্ছাকৃতভাবেই কন্যাকে এ ধরনের আত্মীয়দের সাথে বিশেষভাবে মিশতে দেওয়া হয়। পানির সময় পানি, নাশতার সময় নাশতা এবং ভাতের সময় ভাত দিতে কিশোরী বা যুবতী কন্যাকেই পাঠানো হয়। বিভিন্ন খিদমতে মেয়েরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। পুরুষ থাকলেও যেন হাতে চুড়ি পরে নেয়। ফলে যেন তাদের অবস্থার জিহ্বা এই বলে, 'ঘটে তো ঘটে যাক্, পটে তো পটে যাক্, লাগে তো লেগে যাক্!' অর্থাৎ বিনা পণে বিয়েটা হয়তো হয়ে যাক্!

এমন বাপ-ভাইরা যে দাইয়ুসের শামিল তা বলাই বাহুল্য।

গৃহে দাস-দাসীর বিপত্তি

যাবতীয় অকল্যাণ ও অমঙ্গল অপসারিত করা দ্বীনী ওয়াজেব কর্তব্য এবং সকল প্রকারের ফিতনা ও মন্দের ছিদ্রপথ বন্ধ করা সকলের জন্য শরয়ী আবশ্যক।

বহু পরিবারে দাস-দাসী, চাকর-বাঁদী, মাইন্দার, রাখাল, ড্রাইভার দ্বারা বহু ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে তা জেনেও অনেকে সতর্ক নয়। আবার অনেকে সতর্ক হলেও এ ক্ষতির চোরা দরজা বন্ধ করতে ইচ্ছুক নয়। অনেকে একই গর্তে হাত ভরে কয়েকবারই দষ্ট হয়েছে; কিন্তু কোন কষ্ট অনুভব করেনি। অথবা পড়শীর কারো দেখে-শুনেও অনেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। যা ঈমান দৌর্বল্যের পরিচায়ক এবং এ যুগের মানুষের আল্লাহ-ভীতির ইতির সন্দেশবহ। এখন আমরা দাস-দাসীর মাধ্যমে যে মন্দ ও ক্ষতি পরিবারে আঘাত হানে---তা নিয়ে একটু আলোচনা করব। যাতে এ আলোচনা তাঁদের জন্য সতর্কতামূলক উপদেশ হয়; যাঁদের জীবিত চিত্ত আছে এবং যাঁরা পরিবারের পরিবেশকে সুন্দর ও নির্মল করতে চান।

অবৈধ সম্পর্কের ফিতনা

যুবতী দাসী বাড়িতে রাখলে বাড়ির যুবকদের পক্ষে এক ফিতনার বিষয় হয়।

বিশেষ করে দাসী অসতী প্রকৃতির হলে অঙ্গরাগ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যুবকের মনে যে আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি করবে তা কোন আশ্চর্যের কথা নয়। নির্জনতায় খেতে দেওয়া, তার রুম পরিষ্কার করা, কথাবার্তা বলা ইত্যাদি এ অনুরাগ বৃদ্ধির আরো সহায়ক হয় এবং পরে যা ঘটে তা ঘটে এবং কিছু রটেও বটে।

অনেক সময় গৃহকর্তা এ বিষয়ে খবর রাখে না আবার কানে এলেও মন বলে, 'এটা স্বাভাবিক।' সামনে পড়লে বড় জোর আত্মচেতনাহীন যুলাইখার স্বামীর মত ঠাণ্ডা গলাতেই বলে, 'তুমি কিছু মনে করো না, আর তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।' বাস! আবার পরক্ষণেই আগুনকে বারুদের সংস্পর্শেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে কোর্টে না হলেও পরিশেষে হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে তাদের সমস্যার সমাধান হয়।

c বাড়িতে দাসী রাখলে গৃহিণী সকল কর্তব্য হতে বৈমুখী হয়। কিছু ভুলে যায় এবং কিছুতে অলসতার অভ্যাস তৈরী হয়। ফলে দাসী না থাকলে তার আযাব শুরু হয়।

c দাসী রেখে স্ত্রী নিজ শিশু সন্তানকে তার হাতে সঁপে দিয়ে খালি হাতে বিলাস সুখে উন্মাদিনী হয়। শিশুর প্রতিপালন হয় এ দাসীর হাতে। ফলে দাসীর আকিদা ও চরিত্রের কিছু না কিছু এ শিশুর কাঁচা মনে প্রভাব বিস্তার করে।

c শিশুর প্রতিপালনের জন্য মায়ের স্নেহ ও আদর-যত্ন একান্ত জরুরী। কিন্তু দাসীর হাতে সে স্নেহ, আদর-যত্ন ও আন্তরিকতা না থাকায় শিশু এসব হতে বঞ্চিত হলে তার সে মন-মানসিকতা তৈরী হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিশুও বড় হলে মা-কে ততটা ভালোবাসতে পারে না। অধিকন্তু শিশু মায়ের কথার অবাধ্য হয়, অথচ দাসীর কথার অনুগত হয়।

c দাসী অশিক্ষিতা বা কটুভাষিণী হলে সন্তানের শিক্ষা ও ভদ্রোচিত ভাষার উপরেও কঠোর প্রভাব পড়ে।

c দাসী রাখাতে সংসারে একটা বাড়তি লোকের খরচও বাড়ে। সে খরচ কে মিটাবে তা নিয়ে স্বামী ও উপার্জনশীল স্ত্রীর মাঝে কলহ বাধে। অথচ স্বামীকে বাইরের কর্ম ছেড়ে স্ত্রী যদি বাড়ির কর্ম সামলে নেয়, তাহলে কত মন্দ ও ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায়---তা সকলের অনুমেয়।

c দাসী দ্বারা যাবতীয় কাজ নেওয়ায় অভ্যস্ত মহিলারা বড় কুঁড়ে ও অলস হয়ে পড়ে। ফলে একগ্লাস পানি অথবা এক কাপ চাও গড়িয়ে পান করতে সক্ষম হয় না অথবা মন যায় না। কোন কোন পরিবারের (বিশেষতঃ সউদী আরবের) সুকন্যা আবার বিবাহের আক্দের সময় মোহরের উপর বাপের বাড়ির দাসীকে সঙ্গে নেওয়ারও শর্তারোপ করে! এইভাবে কত নারী আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে পরনির্ভরশীলা হয়ে নিজের শতমুখী ক্ষতি নিজেই ডেকে আনে তার ইয়ত্তা নেই।

c দাসী যখন বাড়ির সকল কাজের ভারপ্রাপ্তা হয়, তখন গৃহিণী অফুরন্ত সময় পায় হাতে। ফলে ঘুমায় বেশী, নিজের বাড়িতে অথবা অনুরূপ প্রতিবেশীর বাড়িতে মজলিস জমিয়ে অথবা টেলিফোনে পরনিন্দা, পরচর্চা, গীবত ও চুগলীতে সময় ব্যয় করে। যাতে শুধু আখেরাত বরবাদ হয়।

c দাসী দ্বারা যোগ-যাদু, বাড়ির যুবতীদের কুটনামি (গুপ্ত প্রণয়ীর সাথে মিলন সংসাধন ও প্রেমপত্র আদান-প্রদান প্রভৃতি), চুরি ইত্যাদিও অনেক বাড়িতে হয়ে থাকে।

c শরীফ ও সম্ভ্রান্ত সুনামজাদা পরিবারে দাসী পরিবারের কোন সদস্যের সাথে অথবা অন্য কোন দাস বা মজদুরের সাথে কোন অপকর্ম করে ফেললে এ পরিবারের নাম ডুবে যায় এবং একটা দুর্নামের বাতাস ছড়িয়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে অসৎ ভৃত্য, রাখাল, কৃষাণ ও ড্রাইভার দ্বারা পরিবারের নির্মল পরিবেশ ঘোলাটে হয়। রাখাল বা কৃষাণকে যদি বাড়িতে থাকার বা ভিতরে আসার সাধারণ অনুমতি দেওয়া যায়, তবে বাড়ির স্ত্রী-কন্যাদের উপর কি প্রভাব ফেলে তা ভুক্তভোগীরা অবশ্যই জানে। ড্রাইভারের সাথে গাড়িতে বাজার করতে অথবা হাওয়া খেতে নানান অঙ্গরাগে ও পারফিউমে সোল্লাসে যখন যুবতীরা বের হয়, তখন দেখে মনে হয়, সে তাদের আপন কোন মাহরামই বটে। এইভাবে স্কুল বা কুটুম্ববাড়ি যেতেও ড্রাইভার থাকে সাথে। পথিমধ্যে আপোষের খোশালাপ ও কোন পরামর্শের মাঝে কথাবার্তায় তাদের হৃদয়বাগে গোপন অনুরাগ জন্ম নেয়। ফলে কোন না কোন দিন ড্রাইভার পরিচিত রোড ত্যাগ করে অপরিচিত রোডে নির্জন পার্ক বা গার্ডেনের উদ্দেশ্যে গাড়ি চালায়।

অতএব অবস্থা যদি এই হয়, সাধুবেশে সধবার স্বামী হয়ে উপপত্নী দাসীর সাথে অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক গড়া হয় এবং সতীর বেশে পতির কূলবধূবেশে যদি উপপতি ভৃত্য বা ড্রাইভারের সাথে অবৈধ ও গর্হিত কর্মে মন দেওয়া হয়, তাহলে পরিবার ও

পরিবেশের অবস্থা কি হবে? দ্বীন-ধর্মের আলো আর কোথায় থাকবে? বিশেষ করে দাস-দাসী যদি অমুসলিম হয়, তবে তারা এই পরিবেশ হতে কি প্রভাব ও শিক্ষা নেবে? তারা কি ভাববে না যে, এটাই ওদের ধর্ম? তারা কি কোন দিন ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা এ সব জানার পর ভুলেও গ্রহণ করবে?

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ বলেন, {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}

"কথা বললে ন্যায্য বল---।" (কুঃ ৬/১৫২)

তাই এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বহু কাফের দাস-দাসীই মুসলিমদের পরিবেশে এসে প্রকৃত মুসলিম হয়েছে। আর বহু দাস-দাসী এমনও পাওয়া যায়, যারা বস্তুতই পাক্কা মুসলিম, অনেক ক্ষেত্রে প্রভুর চেয়েও উত্তম। তারা কাজের ব্যস্ততার মাঝেও গৃহবাসীর অপেক্ষা অধিক নামায-রোযা ও তেলাঅতের পাবন্দ হয়।

আবার বহু পরিবারের জন্য দাস-দাসী যে একান্ত জরুরী---সে কথাও অনস্বীকার্য। বিশেষ করে সেই পরিবারে যাদের সন্তান-সন্ততি বেশী, অথবা গৃহিণী বা গৃহকর্তা দীর্ঘ বা চিররোগী, অথবা কাজ শক্ত হওয়ায় একা করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, শরীয়তি শর্তাবলী এবং তার আনুশাসনিক ধারার অনুবর্তী হয়ে কে সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করে দাস-দাসী ব্যবহার করে? ক'জন আছে যারা দাসীর সাথে নির্জনতাবলম্বন করে না, তার সৌন্দর্যের উপর দৃক্‌পাত করে না, তাকে পর্দার আদেশ দেয় ও পর্দার সাথে রাখে, যখন বাড়িতে আসে, তখন দাসী ছাড়া অন্য কেউ না থাকলে বাড়িতে প্রবেশ করে না এবং কয়টিই বা প্রকৃত মুসলিম দাস-দাসী আছে? সুতরাং যাদের বাড়িতে দাস-দাসী, রাখাল-কৃষাণ অবাধে প্রবেশ করে, আসে যায় তাদের জন্য ভাববার বিষয় যে, তারা প্রকৃতই কি এসব শর্তাবলী মেনে চলে? বস্তুতঃ তাদেরই জন্য ইউসুফ ﷺ-এর ইতিহাসে বড় উপদেশ রয়েছে। আর তাদের জানা উচিত যে, দাস বা ভৃত্য মুত্তাকী হলেও প্রভুপত্নী বা প্রভুকন্যা উপযাচিকা হতে পারে। আল্লাহ বলেন,

{ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ}

"ইউসুফ যে মহিলার গৃহে ছিল সে (ইউসুফের) নিকট হতে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিল ও বলল, 'এসো।' সে বলল, 'আমি আল্লাহর শরণ নিচ্ছি, তোমার স্বামী আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন। সীমালজ্ঘনকারীরা অবশ্যই সফলকাম হয় না।' সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পরত; যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত।" (সূরা ইউসুফ (১২) : ২৩-২৪)

কিন্তু হযরত ইউসুফের মত কে ও কয়জন আছে? অতএব সাবধান!!!

পরন্তু একান্ত দরকারী ক্ষেত্রে উপায় কি?

১- আল্লাহভীতি হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক রাখা এবং ফিতনার ভয় হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। শরয়ী পর্দা ও আদবের অনুগত হওয়া।

২- যথাসম্ভব নিজের কর্ম নিজে করা এবং দাস-দাসী ব্যবহার না করা। একান্ত প্রয়োজনে মাহারেম আত্মীয়-স্বজনদের এক অপরকে সাহায্য করা।

৩- যদি তা সম্ভব না হয়, তবে সাময়িকভাবে অতি প্রয়োজনে শরয়ী আদবের সাথে দাস-দাসী ব্যবহার করা। স্থানীয় মানুষ রাখা; যাতে কাজ সেরে তারা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে রাত্রিবাস করে।

৪- আত্মসচেতনশীল হওয়া। পরিবারের কারো পদস্খলন ঘটছে কিনা অথবা দাস-দাসীর তরফ হতে কোন ত্রুটি হচ্ছে কি না---তা সূক্ষ্ম ও শক্তভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

৫- মন দিয়ে দাস-দাসীদের মন জয় করা, ইখলাস দিয়ে তাদের কাজে ইখলাস নেওয়া। যথা সময়ে তাদের বেতন প্রদান করা। মাঝে-মধ্যে বিশেষ করে ঈদে তাদেরকে ছোট-খাট উপঢৌকন বা হাদিয়া দান করা; যাতে তাদের মনে কাজের একনিষ্ঠতা, মালিকের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ আসে। কিন্তু যে বিলাস-গর্বিত পরিবেশে মানুষকে মানুষ বলে স্থান দেওয়া হয় না। মুসলিমকে মুসলিম বলে এবং আলেমকে আলেম বলে মান দেওয়া হয় না। যেখানে দাস-দাসী ও মজদুর ক্রীতদাস ও কেনা বাঁদী (বরং অনেক ক্ষেত্রে পশু) বলে বিবেচিত হয়, তাদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার নজরে দেখা হয়। বিভিন্ন ছল-ছুতায় তাদের অধিকার নষ্ট করে আত্মসাৎ করা হয়, সামান্য দোষে তাদেরকে গালিমন্দ ও প্রহার করা হয়, মেহনত করে খায় বলেই তাদেরকে এ সমাজে অপাঙ্ক্তেয় করে রাখা হয়। ইসলাম ও মানবতার অমায়িক মধুর ব্যবহার যে পরিবেশে প্রদর্শিত হয় না, সে পরিবেশ আকীদায় শুদ্ধ ও উন্নত হলেও আমলে দুর্গত। এমন পরিবেশ ও সমাজ অতি সহজেই যে ঘোলাটে হবে---তাতে সন্দেহ নেই। অগণিত নিপীড়িত ও অত্যাচারিত দাস-দাসীর ধূমায়মান বদ-দুআর আগুন যখন জ্বলে উঠবে, তখন দর্পহারী ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হবে। যেহেতু অত্যাচারিতের দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল নেই।

এ প্রসঙ্গ ছাড়ার আগে আর একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা সমীচীন বলে মনে হয়। স্কুল-কলেজে যে ছেলে-মেয়ের অবাধ মিলামিশার মাধ্যমে শিক্ষা, তাতে চারিত্রিক দিকটা প্রায় ধ্বংসই হয়েই যায়। অনুরূপভাবে পুরুষ টিউটর দ্বারা কিশোরী বা যুবতী মেয়েকে প্রাইভেট পড়ানো এবং মহিলা টিউটর দ্বারা কিশোর ও যুবক ছেলেকে টিউশনি পড়ানোও কম সর্বনাশা ব্যাপার নয়। তেমনি বাড়ির ভিতরে কোন টিউটরকে নিয়মিত পড়াতে সুযোগ দিলে তাও বড় আকারের দুর্যোগ ডেকে আনতে পারে। সুতরাং পাশের বাড়িতে আগুন দেখে নিজের চালে আগে থেকেই পানি ঢালা বুদ্ধিমানের কাজ বৈকি।

নপুংসক (হিজড়া) ও নারী

অনেক মহিলারা নপুংসক বা হিজড়া এবং নারীসুলভ আচরণকারী পুরুষ মানুষের সাথে নারীসুলভই ব্যবহার করে এবং আপোষে বড় রঙ-তামাশা ও ব্যঙ্গ-পরিহাস করে থাকে। অনুরূপভাবে অনেক পুরুষও হিজড়ে এবং নারীসুলভ আচরণকারী নারীর সাথে পুরুষসুলভ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারেও শরীয়তের অনুশাসন রয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ খোজা পুরুষ এবং পুরুষসুলভ আচরণকারিণী নারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, "তোমাদের গৃহ হতে ওদেরকে বের করে দাও।" তিনি স্বয়ং এক খোজাকে বহিষ্কার করেছেন এবং উমার এক হিজড়ে নারীকে গৃহ হতে বহিষ্কার করেছেন। (আহমাদ ১/২২৫, বুখারী ১০/৩৩)

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন যে, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট ছিলেন। এমন সময় তাঁর গৃহে এক খোজা পুরুষও উপস্থিত ছিল। ইত্যবসরে খোজাটি তাঁর (উম্মে সালামার) ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'আগামী কাল যদি আল্লাহ তোমাদের জন্য তায়েফ বিজিত করেন, তবে আমি তোমাকে (বিবাহ করার জন্য) গায়লান তনয়ার খবর বলে দিচ্ছি। কারণ, সে (এত বড় মেদবহুল সুস্বাস্থ্যবতী যুবতী যে,) যখন সামনে দিকে আসে, তখন তার পেটের চামড়ায় চারটি ভাঁজ দেখা যায় এবং যখন পিছন ফিরে যায়, তখন তার ভুঁড়ির আটটি ভাঁজ দেখা যায়।' (এ কথা শুনে) নবী ﷺ বললেন, "খবরদার যেন এ ব্যক্তি তোমাদের গৃহে প্রবেশ না করে।" (বুখারী ৯/৩৩)

খোজা বলতে সৃষ্টিগত দিক থেকে যে পুরুষ নারীসদৃশ, অথবা আচার-আচরণে চাল-চলনে, পরনে ও কথাবার্তায় যে নারীর মত, তাকেই বুঝানো হয়েছে। অতএব যে সৃষ্টিগতভাবে প্রকৃতই নপুংসক ও খোজা (যে যৌবন ও যৌন বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ) তার পক্ষে কোন ভর্ৎসনা নেই। তাই কে কিরূপ খোজা তা নিরূপণ করায় যথাসম্ভব প্রচেষ্টা করা উচিত। কেবল মেয়েলি আচরণ দেখেই মেয়েদের তাকে মেয়ে ভাবা উচিত নয়।

হাদীসে বর্ণিত উক্ত খোজা খাদেমস্বরূপ রসূল ﷺ-এর গৃহসমূহে একজন নারীর মতই প্রবেশ করত। কেননা সে পর্দার আয়াতে (সূরা আন-নূর (২৪) : ৩১) যৌন কামনারহিত পুরুষদের মধ্যে গণ্য ছিল; যাদের থেকে মহিলাদের পর্দা নেই। কিন্তু তিনি যখন তার নিকট হতে নারীর রূপ ও সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম বর্ণনা শুনলেন এবং দেখলেন যে, এমন এক অঙ্গনার দেহসৌষ্ঠব বর্ণনা করছে যার (উদরে মেদ জমার ফলে) সম্মুখে চারটি এবং পশ্চাৎ দিকে আটটি ভাঁজ পরিদৃষ্ট হয়। যাতে বুঝা যায় যে, নারী ও যৌন সম্পর্কে তার সম্যক্ জ্ঞান বিদ্যমান। তাই তাকে গৃহ হতে বহিষ্কার করে পুনরায় পত্নীদের গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। কারণ, তার দ্বারা চারিত্রিক ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা ছিল। যেমন পত্নীদের সাথে মিশে বাইরের কোন পুরুষকে তাদের দেহ সৌষ্ঠবাদি বর্ণনা করতে পারত। অথবা নারীরা তার উপর প্রভাবান্বিত হয়ে তার

অনুকরণে পুরুষসুলভ আচরণ করতে লাগত। অথবা পুরুষরা তার নিকট নারীসুলভ আচরণ করতে প্রভাব পেত; যেমন চলনে বঙ্কিমতা, বলনে কোমলতা ইত্যাদি। অথবা তার দ্বারা অন্য মারাত্মক কিছু ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা ছিল। আর সে জন্যই তাকে অভিসম্পাতও করা হয়েছে।

অতএব এই আদর্শে গৃহস্বামীকে উপদেশ গ্রহণ করে পরিবারের চরিত্র গড়তে সতর্ক হওয়া উচিত এবং এও খেয়ালে রাখা উচিত, যাতে বিজাতির অনুকরণে নিজের পরিবেশ ঘোলাটে না হয়ে যায়।

রক্ষণশীল (?) ও প্রগতিশীলের দ্বন্দ্ব

এক দম্পতি তাঁদের তরুণী মেয়ের সাথে চা পান করছিল। মেয়ের দেহে যে ড্রেস ছিল তা নিউ ফ্যাশনের, মডার্ন। বেসামাল পোষাক। ড্রেসটা বাবার খুবই পছন্দ।

তিনি বলে উঠলেন, 'তোর মা বড় সেকেলে। ওর এই ধরনের পোশাক পছন্দ নয়।'

মা বলল, 'ওই বেহায়ামী আমি পছন্দ করি না।'

চট্ করে মেয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু এটাই তো সভ্যতার দাবী। তুমি পুরনো মানুষ বলে এসব দেখতে পার না। যারা এ যুগের মানুষ তারা এসব খুব চায়।'

বাবা বলল, 'অবশ্যই, এটা বিজ্ঞান ও কম্পিউটারের যুগ। তোমাদের যুগ এবার গেছে।'

এমন সময় বাড়ির কলিং বেলটা বেজে উঠল। বাবা উঠে গিয়ে দরজা খুললেন।

মেয়ের (সহপাঠী) বন্ধু এসেছে মেয়েকে দেখা করতে। তিনি বৈঠকখানাটি খুলে দিয়ে মেয়ের উদ্দেশে বললেন, 'ওরে আফরীন! নিয়ায এসেছে। চা নিয়ে যা।'

বাবা মায়ের কাছে ফিরে এলেন। মেয়ে চা নিয়ে বৈঠকখানায় গেল। আধঘণ্টা পর মেয়ে হাসিমধুর মুখে বাবাকে এসে বলল, 'বাবা! আজ আমি একটু সিনেমায় যাব।'

চট্ করে মা চোখ ডাগর করে বলে উঠলেন, 'কার সাথে?'

মেয়ে বলল, 'নিয়ায যাবে।'

মায়ের তরফ থেকে কোন উত্তর আসার পূর্বেই বাবা বলে উঠলেন, 'যা না, অসুবিধে কি?'

মেয়ে আরো একটু নিজেকে সজ্জিতা (মেকআপ) করে অসংযত পোশাকে বন্ধুর সাথে বেড়িয়ে গেল।

মা শুধু ভ্যাল্‌ভ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর মেয়ের প্রগল্‌ভ চলন। বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'মেয়েটি বেশ "স্মার্ট" হয়ে উঠছে। কলেজের ছাত্রী কি না।'

স্ত্রী এক ইসলামী পরিবেশের পর্দাপ্রেমী মহিলা। মেয়ের চালচলন তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু স্বামী হলেন, বিলেত-ঘেষা প্রগতিশীল মানুষ। তাঁরই পরিচর্যায় মেয়েও প্রগতিশীল। স্বামীর আগে বলারও কিছু নেই।

মেয়ের এমন লাগামছাড়া স্বাধীনতা দেখে মায়ের সহ্য না হয়ে কিছু বললে বাবা তার মুখ নেন। মাকে কখনো 'রক্ষণশীল', কখনো 'সেকেলে', কখনো 'গোঁড়া' আবার কখনো 'যুগপঁচা' মেয়ে বলে বিদ্রূপ করেন। মা কখনো কখনো লোকলজ্জার, কখনো বা অকাল-গর্ভের কথা তুলে বাবাকে ভয় দেখান। কিন্তু বাবা বলেন, 'সভ্য লোকেরা কোনদিন তা খারাপ মনে করবে না। আর কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেই কি কেউ এ সব কাজ করে নাকি? এত নীচ ধারণা নীচ লোকেরাই করে থাকে।' ধর্মের ভয় দেখালে তো বাবা হেসে গড়িয়েই যান। বলেন, 'তুমি এ মোল্লাদের কথায় বিশ্বাস রাখ? মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্ত। যুগের চাহিদা ওরা কি বোঝে? উদার হতে শেখো। গোঁড়া হয়ে থেকো না। মেয়ে বড় হয়েছে। ভালো-মন্দ ও নিজে খুব বোঝে। মেয়ের স্বাধীনতায় মা-বাপের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।'

এমন কি বিয়ের ব্যাপারেও না। ও তো নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করতে পারে। আজকের বন্ধু পছন্দ না হলে কালকের কোন অন্য বন্ধুকে স্বামীরূপে ঘরে আনবে। তাতে মা-বাপের বাধা কিসের? চিন্তা কিসের? অবশ্য রক্ষণশীল ঘরে পদে পদে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা আছে; কোন প্রগতিশীল ঘরে নয়।

রক্ষণশীল (?) ও প্রগতিশীলের দ্বন্দ্বের বিচারভার রইল অবিকৃত ও সুস্থ মস্তিকের পবিত্রতা ও শান্তিকামী মানুষের উপর।

একশ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁরা স্ত্রী ছাড়া নারী জাতির দিকে কামনজরে দৃকপাত করেন না। বাড়িতে তাঁদের স্ত্রীরা সভ্য লেবাসে থাকে বলে যখন তখন যৌন উত্তেজনাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঋতু অবস্থায় তাঁরা স্ত্রীগমন করেন না। মিলনের পর তাঁদের উপর গোসল করা ফরয বলে যখন-তখন মিলনও করতে পারেন না। নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য মহিলা ব্যবহার করেন না। বরং অন্য মহিলার দেহ দর্শন ও স্পর্শমাত্রকেও পাপ মনে করেন। যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় কোন পরস্ত্রীর সাথে নির্জনবাস করেন না। সাধারণের উপভোগ্য হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁরা নিজেদের মহিলাদেরকে সংযত পোশাকে বাইরে পাঠান। উভয় পক্ষের প্রেম ও ইচ্ছার সাথে হলেও যাঁরা ব্যভিচারকে বড় অপরাধ বলে জানেন। অবিবাহিত হলে ১০০ চাবুক এবং বিবাহিত হলে মৃত্যুদণ্ড শাস্তির প্রচলন করেন। যাঁদের নিকট ধর্ষণের মত অপরাধের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর লোকেরা মহিলাদেরকে যথার্থ সম্মান ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখেন। মায়ের পদতলে জান্নাত আছে বিশ্বাস রাখেন। পুরুষের উপর নারীর খোর-পোষ ওয়াজেব মনে করেন।

পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর মানুষ। যাঁরা নারীকে খোলামেলা দেখতে পছন্দ করেন। অসভ্য লেবাসে নারীর রূপলাবণ্য দেখে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করেন। পথে-ঘাটে অফিসে-কলেজে অশালীন বেশভূষায় দেখতে 'নারী-স্বাধীনতা' মনে করেন। যাঁরা বাইরে নারীর এ অর্ধনগ্ন রূপলাবণ্য দর্শন করে এসে স্বপ্নে বা জাগরণে বীর্যক্ষয় করেন। অথবা যাদের আছে একাধিক গার্ল্‌স ফ্রেন্ড, সময় মত তাদের যৌনসম্ভোগ করতে পারেন। যাঁরা বাড়িতেও যখন তখন স্ত্রীসঙ্গম করেন; কারণ তাঁদের স্ত্রীরাও সর্বদা সেক্সী ড্রেসে থাকে, তাছাড়া মাসিক-গোসলের তো কোন বাধাই নেই। যাঁরা বাস-ট্রেন, পার্ক, স্কুল-কলেজ, অফিসে-আদালতে তরুণী-যুবতীর পাশাপাশি বসে উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করেন। নিশ্চিন্তে গার্ল্‌স ফ্রেন্ডের সাথে বিলাস-বিহারে যান। যাঁরা নিজ স্ত্রীকন্যাকেও কারো (অবৈধ) স্পর্শে আসতে বাধা দেন না। যাঁরা মহিলাদের প্রতি হ্যাংলা কুকুরের মত তাকিয়ে যৌন-জিভে লালা ফেলেন। যাঁরা ব্যভিচারের মত অপরাধকে কোন অপরাধ মনে করেন না। যাঁদের নিকট ধর্ষণের মত অপরাধের যথেষ্ট বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি নেই। যাঁরা তরুণীকে 'ইয়ে করে বিয়ে করতে' অথবা নিয়ে চম্পট দিতে আগ্রহী। যাঁরা অফিসার স্ত্রীকে বাপ-মায়ের খিদমতে লাগাতে এবং নিজেও মায়ের পদসেবা করতে আগ্রহ রাখেন না। যাঁরা মহিলার কামাই বসে খেতে চান এবং মহিলাকে বিভিন্ন বাণিজ্য এবং তার প্রচার ও বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেন। এই শ্রেণীর মানুষ মহিলাদের অবাধ যৌনাচারে (ফ্রী সেক্সে) বিশ্বাসী।

বিচারভার রইল জ্ঞানী মানুষের উপর। প্রথম শ্রেণীর মানুষরা নারীকে 'ভোগ্য বস্তু' বলে মনে করেন, নাকি এ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা? যাঁরা কমলা গোপনে রাখেন এবং সংযত ও সঙ্গতভাবে খান তাঁরা কমলাকে ভোগের বস্তু বলে মনে করেন, নাকি তাঁরা; যাঁরা কমলা প্রকাশ্যে খান, ছিলে রেখে লোকের সামনে 'অফার' ও 'এ্যাভেলেবল' করেন, রাস্তা-ঘাটে তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা ও আন্দোলন করেন এবং তা চোখে দেখলে জিভের পানি ফেলেন?

পরিবেশ গুণে পরিবর্তন আসে মানুষের সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার। অনেকে দু' পাতা ইংরেজী পড়েই দ্বীন ও ইসলামী মূল্যবোধকে 'সেকেলে' ইত্যাদি বলে নাক সিটকায়! কত ভালো ঘরের ছেলে-মেয়েরাও ঐ পরিবেশে গিয়ে ধর্মীয় নৈতিকতাকে প্রগতির (যৌন-স্বাধীনতার) অমূলক 'সামাজিক প্রতিবন্ধক' বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকে। এমন কত শত 'নিত্য চাষার ঝি, বেগুন ক্ষেত দেখে বলে ইয়া আবার কি?' অনেকে জীবনে কম্পিউটার হয়তো চোখেও দেখেনি; কিন্তু কম্পিউটার ও তার যুগের দোহাই দিয়ে নিজেদের জীবনের চারিত্রিক নৈতিকতাকে শিথিল করে ফেলেছে। এরা যৌবনের উন্মাদনায় ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আর বুঝতে পারে না যে, তারা মশা মারতে নিজেদেরই গালে চড় মারছে। অবশ্য একদিন তাদেরকে এই প্রবাদ স্মরণ করতেই হবে, 'আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে, পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের ঝোরে।'

যুগ কম্পিউটারের, তা তো কেউ অস্বীকার করে না। কম্পিউটার এসেছে যুগের মানুষের জীবন-ধারা বদলে দিতে, ধর্ম-ধারা নয়। কম্পিউটার মানুষের ইহলৌকিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের তুফান এনেছে, কোন পারলৌকিক বা চারিত্রিক উন্নয়ন সাথে আনেনি। তাছাড়া কালজয়ী ইসলাম বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের পথে কোন প্রতিবন্ধকও নয়। তবুও মানুষ ধর্ম ও নৈতিকতার কথা শুনলেই বিজ্ঞান ও কম্পিউটারের দোহাই দিয়ে খোঁড়া অজুহাত দেখায় কেন?

কোন মহিলাকে পর্দায় থাকতে বলুন। সে বা তার পিতা, স্বামী বা আর কোন দরদী তখন আপনাকে উত্তর দেবে, 'এ যুগ কম্পিউটারের যুগ! আধুনিক যুগ!'

কাউকে মদ্যপান অথবা ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে বলুন। দেখবেন সেও আপনাকে প্রায় একই গতের উত্তর দেবে। অথচ একটু গভীরভাবে তলিয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, নৈতিকতার সাথে কম্পিউটারের কোনও সংঘর্ষ নেই।

পক্ষান্তরে আধুনিক যুগের দাবী যদি বেপর্দায় খোলামেলা বেসামাল পোশাকে থাকা, মাদকদ্রব্য সেবন করা, ছেলে-মেয়ের আপোসে বন্ধুত্ব স্থাপন করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করা হয়, তাহলে আজকের আধুনিক আর কালকের জাহেলিয়াতের যুগের মাঝে পার্থক্যটা থাকল কোথায়? এঁরা পর্দাপ্রথা মেনে চলে, সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য বর্জন করে, সকল প্রকার নৈতিকতা বরণ করে নিলে যদি প্রাচীনপন্থী ও সেকেলে হন, তাহলে ওঁরা ঐ তথাকথিত নারী স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতায় কি আরো অধিকতর প্রাচীনপন্থী ও সেকেলে নন্? কারণ, আধুনিক যুগের যে দাবী সে দাবী তো ইসলামের পূর্বেও ছিল। সুতরাং ওঁদের এ আধুনিক জীবন-পদ্ধতি কি অধিকতর 'যুগপঁচা' নয়? ইসলামের পূর্বেই প্রচলিত ছিল ছেলে-মেয়ের অবাধ বন্ধুত্ব করার প্রথা। কুরআনে (৪/২৫, ৫/৫) তা খণ্ডন করা হয়েছে। ইসলামের পূর্বেই ছিল খোলা-মেলা পোষাক পরে স্বাধীনভাবে নারীদের নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়ানোর ফ্যাশন। কুরআনের সূরা আহযাবের ৩৩ আয়াতে তার খণ্ডন করা হয়েছে। মাদকদ্রব্যও কুরআনে নিষিদ্ধ হয়েছে।

সুতরাং গোঁড়া ও রক্ষণশীল তো ওঁরাও। বরং ওঁরাই বড্ড ও বেশী গোঁড়া। কারণ, এঁরা তো মাত্র ১৪ শত বৎসরের পুরানো নৈতিকতাকে ছাড়তে রাজী নন। আর ওঁরা যে আরো পুরানো প্রায় ১৫ শত বছর ; বরং তারও অধিক বৎসরের প্রাচীন ট্রেডিশনকে ছাড়তে মোটেই রাজী নন।

একই কক্ষে ২ জন বসবাসকারীর মধ্যে একজন ধূমপায়ী বন্ধু তার অপর অধূমপায়ী বন্ধুর নাক সিটকানি দেখে যদি বলে, 'তুই বড় গোঁড়া! বারবার আমাকে সিগারেট খাওয়া ছাড়তে বলিস্।' তখন এর উত্তরে তার অধূমপায়ী বন্ধুও যদি বলে, 'তুইও তো বড় গোঁড়া! তোকে বারবার সিগারেট খাওয়াটা ছাড়তে বলি, তাও ছাড়িস না!' তাহলে আসল গোঁড়াটা কে? নৈতিকতা পালনকারী, নাকি নৈতিকতা বিনাশকারী?

ইসলামের দৃষ্টিতে অসংযত ও খোলামেলা লেবাস ঘৃণিত। খোলামেলা লেবাস সাধারণতঃ দাসীদের হয়। (সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৫৯) মুসলিম নারীদেরকে পর্দার আবরণ গ্রহণ করে সম্ভ্রান্তারূপে পরিচয় দিতে আদেশ করেছে। অথচ সাম্যবাদী কবি গেয়েছেন তার উল্টা। তিনি নারীর উদ্দেশ্যে বলেন,

'চোখে চোখে আজি চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ,
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ!'

কবি যে একাকারের কথা গেয়েছেন ও চেয়েছেন তা তিনি নিজে বলেন,

'সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!'

আর এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ}

"তারা কবিদের অনুসরণ করে, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না যে, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে কল্পনাবিহার করে থাকে এবং যা বলে তা করে না।" (সূরা আশ-শু'আরা (২৬) : ২২৪-২২৬)

পরিশেষে প্রশ্ন যে, কারা চির উন্নত? যারা মাত্র ৭০/৮০ বছরের সুখদ ভোগবিলাসের সামগ্রী হাতে পেয়েছে তারা, নাকি যাদের হাতে আছে চিরকালের সুখ ও শান্তির বিলাস-রাজ্য? মোটকথা এ দ্বন্দ্ব হল, ইসলাম ও পাশ্চাত্য-সভ্যতার দ্বন্দ্ব। হক ও বাতিল, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, চির সভ্যতা ও অধুনা অসভ্যতার দ্বন্দ্ব। আর জয় চিরদিন সত্যেরই।

কিশোরী, তরুণী ও যুবতীর প্রতি

কৈশোর ও তারুণ্য বয়সে প্রায় সকল মানুষেরই সঙ্গীর খোঁজ একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। এ সময়েই প্রেম ও ভালোবাসার পাত্র প্রায় সকলের অভিপ্রেত হয়। তাই এই অবস্থায় কয়েকটা উপদেশ জ্ঞানী তরুণীর জন্য পালনীয় ঃ-

১- পর্দা অবলম্বন কর, যাতে তোমার প্রতি কারো কুনজর আকৃষ্ট না হয়।

২- ঘটনাক্রমে এমন প্রেমালাপ কারো সাথে ঘটে থাকলে এবং বিয়ের অঙ্গীকার দিয়ে থাকলেও তাতে বিশ্বাস করো না। কারণ, সে এমন যুবক হতে পারে, যে তোমার মান রক্ষা করবে না। অথচ তুমি তোমার অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে। তাদের চোখে ধূলা দিয়ে তার সাথে কথা বলবে, তার

সঙ্গে বাইরে যাবে, 'বিয়ে তো হবেই' মনে করে তুমি তাকে তোমার সব কিছু বিলিয়ে দেবে ইত্যাদি। তাতে যতই সে তোমার প্রতি অন্তরঙ্গতা ও অকপটতা প্রকাশ করুক, যতই মুখে মিষ্টি কথা বলুক এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করুক। তুমি জেনো যে, তা কপট প্রেমের অভিনয় মাত্র, যা কেবল সে নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে।

৩- এ কথা কখনো সত্য মনে করো না যে, তোমাদের বিয়ের অঙ্গীকার কেবলমাত্র আবেগপূর্ণ কথায় পালন করা হবে। আর যদিও বা কোন চাপে পড়ে তা পালন করে বিবাহ হয়েই যায়, তবুও তোমাদের দাম্পত্য ধ্বংস, অসফলতা, সন্দেহ ও পরিতাপের শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশী থাকবে।

৪- খবরদার নারী স্বাধীনতাবাদীদের বিভিন্ন প্রচার ও প্রপাগাণ্ডায় কান দিও না।

ওরা আসলে যৌন-স্বাধীনতা (ফ্রী সেক্স) চায়, বিবাহের পূর্বে প্রেমের বাঁধন চায়। অথচ বিবাহের পর ছাড়া অকৃত্রিম প্রকৃত প্রেম সঞ্চার সম্ভব নয়। যেহেতু বিবাহের পূর্বের ভালোবাসায় কৃত্রিমতা ও অভিনয় থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ গড়া প্রেম কেবলমাত্র কামচরিতার্থতা ও যৌনতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও অবাস্তব কল্পনার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। যার ফলে অনতিদূরে সেই শিশমহল ভগ্নপ্রাপ্ত হয়।

৫- তোমার সাথে বিবাহ হারাম নয় এমন কোন যুবকের সাথে টেলিফোনে কথোপকথন করো না। যাতে প্রেমালাপে তার কৃত্রিম জালে মাকর্ষার জালে পোকা পড়ার মত তুমিও ধরা পরতে পার। তোমার এ প্রেমালাপ আল্লাহর নিকট রেকর্ড করা থাকবে এবং তোমার কপট প্রেমিকও রের্কড করে রেখে পরে তার কথার বশে না গেলে তোমার সম্ভ্রম লুটে তোমাকে অপদস্থ করবে। যখন না তুমি তার হবে, আর না-ই সে কাউকে তোমার হতে দেবে। কষ্ট পাবে অভিভাবক ও আত্মীয়রা। আর তুমিও যৌবনের দাহে চিরকাল একাকিনী হয়ে দুঃখ-জ্বালা ভোগ করবে। যখন ভাই ও ভাবীর চোখের বালি হবে এবং তোমার মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়বে।

৬- ছবি তোলা থেকে সাবধান থেকো। তোমার পাণিপ্রার্থী ইচ্ছা করলে তোমাকে সরাসরি দেখে যাবে। তোমার ছবি কাউকে দেবে না। নচেৎ তোমার বংশের মান মাঠে-ঘাটে হবে। আর তোমার রূপের উপরও বিভিন্ন অসমীচীন মন্তব্য ও টিপ্পনী কাটা হবে।

৭- খবরদার কারো সাথে প্রেমপত্রালাপ করবে না। এতেও তুমি খুব সহজরূপে লাঞ্ছনার শিকার হবে। কল্পনার জগতে বাস করে পরিশেষে আক্ষেপই তোমার চিরসঙ্গী হবে।

৮- নোংরা পত্র-পত্রিকা পড়া থেকে বিরত থাকবে। কারণ, তাতেও তোমার সম্ভ্রমহানিকর বিষ লুক্কায়িত থাকে।

৯- ফিল্ম্ দেখা থেকে দূরে থাকবে; যা তোমার শত্রুর এক বন্ধু। অজান্তে এ বন্ধু তোমাকে বধ করবে। যাতে তোমার লজ্জাশীলতা হারিয়ে যাবে, সম্ভ্রম লুপ্ত হবে এবং তোমার সুন্দর চরিত্র ধ্বংসের কবলিত হবে।

১০- তোমার সাথে বিবাহ হারাম নয় এমন আত্মীয়-স্বজন তোমার গৃহে এলে তাদের সাথে অপ্রয়োজন কথাবার্তা ও খিদমত করা থেকে দূরে থাকবে। মার্কেট ও দোকান করা থেকে সাবধান থাকবে। একান্ত প্রয়োজনে নিরুপায় হলে আল্লাহর ভয় ও শরয়ী পর্দা ভুলে যেয়ো না।

১১- ড্রাইভারের সাথে গাড়িতে বা কোন ভৃত্য ইত্যাদির সাথে নির্জনতাবলম্বন করবে না। কারো গাড়িতে বা রিক্সায় একাকিনী যাবে না। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবকদের পাশাপাশি বসে বেপর্দায় স্কুল-কলেজে পড়বে না। গার্লস স্কুল-কলেজে পড়বে। মাহরামের সঙ্গে যাবে আসবে। দেহে ফুল ফুটলে আর সে আত্মীয় বাড়ি যাবে না; যেখানে তুমি নিজেকে পর্দা করতে পারবে না।

১২- চরিত্রহীনা ও নোংরা মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা স্থাপন করবে না। কারণ সংক্রামক ব্যাধির মত তোমার চরিত্রেও নোংরামি সংক্রমণ হতে পারে। আর জানো তো, 'সঙ্গদোষে কি না হয়? ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।'

১৩- বাড়ির ভিতর ছাড়া বাইরে কোন পুকুর, নদী বা সমুদ্র ঘাটে গোসল করতে যাবে না। কারণ, শয়তান জিন ও মানুষ তোমার অপেক্ষায় থাকতে পারে।

১৪- আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর দ্বীনের অনুসরণ কর এবং আল্লাহর নিকট দুআ কর।

তিনি তোমার সৌভাগ্যের সাথে মনের মত সঙ্গী দান করবেন। পরন্তু উপযুক্ত জীবনসঙ্গীরূপে তোমার কাউকে পছন্দ হয়ে থাকলে বৈধ উপায়ে তার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে। তবে পছন্দ হওয়ার পর কাউকে তোমার হৃদয় বিলিয়ে দিও না। নচেৎ তার সাথে না হয়ে কোন কারণে অপরের সাথে তোমার বিবাহ সম্পন্ন হলে তুমি তার সংসার করবে ঠিকই; কিন্তু দেহ থাকবে স্বামীর কাছে আর মন পড়ে থাকবে সেই ভালো লাগা 'মনের মানুষ'টির কাছে। এতে হয়তো বা কখনো স্বামীর খেয়ানতও করে বসবে! সুতরাং এমন কলঙ্ক আসার আগে তুমি তোমার মনের কালিমা দূর করে নিয়ো, সেটাই ভালো।

'টি,ভি' নয় 'টি,বি'

গৃহকে আনন্দনিকেতন করার জন্য এ যুগের সহজলব্ধ উপকরণ টেলিভিশন। অধিকাংশ গৃহকর্তারই দু'টো পয়সা হলেই সর্বাগ্রে টি,ভি ক্রয়ের প্রোগ্রাম হয়। নতুবা গৃহিণীর নিকট হতে প্রত্যহ নিন্দাবাদ শুনতে হয় অথবা সপ্তাহান্তে একবার না হলেও মাসান্তে একবারও তাকে প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে যেতে বা পাঠাতে হয়। যুগের তালে তালে তালি বাজিয়ে মুসলিমরাও এ উপকরণ গৃহে স্থাপন করতে শুরু করেছে। প্রায় প্রতি ঘরেই এক প্রকার সংক্রামক টি,বি ব্যাধির মতই টি,ভির ছোঁয়াচ সকলকে পেয়ে বসেছে। টাকার চুলকানিতেই এই রোগের সূত্রপাত হয়।

অবশ্য এর উপকারিতাও অস্বীকার করা যায় না। তবে এর উপকারিতার চেয়ে (বিশেষ করে মুসলিমদের জন্য) অপকারিতাই বেশী। আর এর দ্বারা বৈধভাবে উপকৃত হবার লোকের সংখ্যা হয়তো বা খুব কমই আছে।

অশ্লীল ছায়াছবি প্রদর্শন, বিশেষ করে বহির্বিশ্ব টি,ভি প্রোগ্রামে পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং তার সাথে ভি,সি,আর-ভি,সি,পির যোগে নোংরা (নীল) ছবি দর্শন ইত্যাদির অপকার সম্পর্কে সুরুচিপূর্ণ সামাজিক মানুষের ভালোই জ্ঞান আছে।

এই টি,বি-র অপকারিতা ও অনিষ্টকারিতা প্রসঙ্গে একটি সমীক্ষা নিম্নরূপ ঃ-

আক্বীদাহগত অপকার

❁ কুফরী ও বাতিল ধর্মবিশ্বাস, প্রতীক ও উপাস্য প্রদর্শন ও প্রচার করা হয়। যাতে মুসলিমের আকিদা ও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত পড়ে অথবা দুই আকিদার সংমিশ্রণ ঘটে।

❁ বহু চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয় যে, একজন মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হচ্ছে। অথবা কোন গাছ-পাথরে কারো জীবন অথবা মরণ দান করছে, কোন কবরের নিকট সন্তান চেয়ে সন্তান হচ্ছে ইত্যাদি। যাতে অজ্ঞ মুসলিমরা জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ ও কবরবাদে বিশ্বাসী হয়ে বসে।

❁ অলীক ও অসার কর্মকাণ্ড, তেলেস্মাতি ও ঐন্দ্রজালিক বিষয়, জাহেলিয়াতি, কুসংস্কার, জ্যোতিষগণনা, কথায় কথায় গায়রুল্লাহর নামে কসম, আল্লাহ ও ধর্ম নিয়ে, তকদীর বা ভাগ্য নিয়ে বিদ্রূপ ও পরিহাস প্রভৃতির প্রচার ও প্রদর্শন যা তওহীদের পরিপন্থী।

❁ এমন ইসলামী পরিবেশ প্রদর্শিত হয় (যেমন গান-বাদ্য-মদ্য-নারীতে সরগরম) যাতে মনে হয় মুসলমানরা এ রকমই। অনেকে তার অনুকরণ করার চেষ্টাও করে।

❁ কাফের অভিনেতা ও অভিনেত্রীর তাযীম মুসলিমের মনে স্থান পায়। তারা তাদের নিয়ে গর্ব করে। বরং তাদের ছবি বাড়িতে টাঙ্গিয়ে রেখে পূজা করে এবং বিভিন্ন ফ্যাশন ও কাটিং-এ তাদের অনুকরণ করে। যেমন পুরুষের চুলে বচন বা মিথুন কাট, নারীর চুলে সাধনা কাট। তাছাড়া চলনে, বলনে, প্রেমেও তাদের অভিনয়ের অনুকরণ করা হয়।

❁ ধর্ম পরিত্যাগ করে একাকার হওয়ার আহবান, সব ধর্ম সমান হওয়ার শ্লোগান ইত্যাদি; যাতে মুসলিমের আকিদাহ ও তওহীদ ধ্বংস হয়ে যায়।

❁ প্রচার হয় ভিন্ন ধর্ম ও বাতিল মতবাদ; কিন্তু মুসলিম তা দর্শন করে নিজের ধর্ম হারায়।

সামাজিক অপকার :

❁ অপরাধী অথচ সম্মানিত, মহাপরাধ করলেও সম্মান পাওয়া যায় তা প্রদর্শন।

❁ খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, মার-পিট প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়ার প্রতি আহ্বান।

❁ চুরি-ডাকাতি, অপহরণ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, স্মাগ্লিং (অপানয়ন), ঘুসখোরী, মিথ্যাচরণ প্রভৃতির উপায় ও পদ্ধতির শিক্ষাদান।

❁ এরূপ ফিল্ম্ দর্শনে অনেক কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর মস্তানি, গুণ্ডামি, ইতরামি, চৌর্য, ফাইটিং ইত্যাদির মানসিকতা গড়ে ওঠে।

❁ নারীকে পুরুষসুলভ আচরণ এবং পুরুষকে নারীসুলভ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধকরণ। যাতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ করেছেন। অভিনয়ে একজন পুরুষ নারী সাজে, নারীর পরন, চলন ও বলন ধারণ করে, কৃত্রিম কেশ ও বক্ষোজ ব্যবহার করে, অলঙ্কারাদি এবং অঙ্গরাগ দ্বারা সুললিতা রঙ্গিনী সাজে। অনুরূপভাবে একজন নারী কৃত্রিম শ্মশ্রু ব্যবহার এবং পৌরুষ কণ্ঠস্বর নকল করে পুরুষ সাজে; যাতে সমাজে কেমন যেন একটা লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসার হয়।

❁ রসূল, সাহাবী আলেম বা মুজাহিদের পরিবর্তে কোন হিরো বা হিরোইন এবং নর্তকী বা খেলোয়াড় দর্শকের আদর্শ ও অনুকৃত হয়।

❁ পরিবারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার অভাব দেখা দেয়। ফিল্ম্ বা কোন চিত্তাকর্ষী প্রোগ্রাম চলাকালীন অসুস্থ পিতা-মাতা বা স্ত্রী-পুত্র কারো প্রতি খেয়াল থাকে না। এই উন্মাদনায় কখনো বা কেউ খেতেও ভুলে যায়।

❁ অনেক সময় প্রোগ্রাম দেখার জন্য ছেলে-মেয়ে, প্রতিবেশী বা আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতি বিরক্তি ও অভক্তি প্রকাশ করা হয়। কারণ, তারা এ প্রোগ্রামের সময়ই তার ডিস্টার্ব করে তাই।

❁ পর্দার সামনে বসে থেকে যে সময় নষ্ট হয় তাতে সমাজের বহু কাজে অলসতা ও মন্থরতা আনে। উন্নয়নের পথে এক বাধা পড়ে।

❁ ছবির কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর রূপ ও সৌন্দর্য বিচার নিয়ে কখনো কখনো দাম্পত্যে কলহ দেখা দেয়।

❁ অবিরাম চলচ্চিত্র দর্শনে আত্মসচেতনশীলতা এবং রুচিসম্পন্নতা অপসৃত হয়। যখন অভ্যাসগতভাবে স্ত্রীর পর্দাহীনতা, কন্যা ও ভগিনীর নগ্নতা দেখেও কিছু মনে হয় না। কারণ, পূর্বেই সে নারী ও স্ত্রী স্বাধীনতা এবং বল্গাহীন জীবন যাত্রার এক সভ্য হয়ে যায়।

❁ 'ফ্রি সার্ভিস' রঙ মহলে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীর ভিঁড় জমে। গ্রামে বা পাড়ায় একটি মহল হলেই ঐখানের পরিবেশ ঘোলাটে করার জন্য যথেষ্ট হয়। সাধারণ মজলিসে বা পথের ধারে প্রদর্শনী হলে প্রকাশ্য পাপে লিপ্ত হওয়া ও করা হয়। অথচ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "প্রত্যেক উম্মতি ক্ষমার্হ; কিন্তু তারা নয়, যারা পাপ প্রকাশ্যে করে।" (বুঃ, মুসলিম)

চরিত্রগত অপকার :

❁ চলচ্চিত্রে নারী-পুরুষের নগ্ন রূপ প্রদর্শনে যৌনকামনা জাগরিত করা হয়।

❁ ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সেই যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং অপক্ক বয়সেই 'ইচর-পাকা' হয়ে যায়।

❁ এমন ভ্যারাইটিজ কাটিং-এর পোষাক পরিহিত মডেল যুবক-যুবতী প্রদর্শিত হয়, যাতে আধুনিকতা ও ফ্যাশানের নামে থাকে নগ্নতা। রুচিবান মানুষ যার দিকে দৃষ্টিপাত করতেও লজ্জাবোধ করে। অথচ নির্লজ্জ দর্শক যুবক-যুবতীরা তাদের অনুকরণে সেই বেসামাল ও সেক্সী ড্রেস সবার সামনে ব্যবহার করতে গর্ব অনুভব করে।

❁ ভালোবাসা ও প্রেম প্রশিক্ষণ। অবৈধ প্রণয় ও অন্যায় সম্পর্ক গড়ার উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানদান। প্রেম বিনিময়, অভিমান, অভিসার, উপযাচকতা, টিস-কিস ইত্যাদির হাতে-কলমে শিক্ষাদান।

❁ বিবাহের পূর্বে দম্পতির একত্রে স্বাধীন আহার-বিহার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রদর্শন। যাতে প্রভাবান্বিত হয়ে আজকাল অনেক ছেলে-মেয়েই নিজের বিবাহের জন্য আর মা-বাপের তোয়াক্কা করে না। বরং 'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া, ছুপ- ছুপকে আহেঁ ভরনা কিয়া' বলেই উন্নাসিকতায় বিনা খরচে পিতামাতার ঘরে ইঙ্গবঙ্গীয়া বা হিনমুস বউ ঘরে নিয়ে আসে। তবে মজার কথা এই যে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ এমন দাম্পত্য অধিকাংশই টিঁকে না। কারণ, প্রায়শঃ এসব পিরিত বা পিয়ারে কেবলমাত্র এক প্রকার যৌনপীড়া বা পিপাসা থাকে। সেই পীড়া বা পিয়াস দূর হলেই সব দূর হয়ে যায়।

❁ অধিকাধিক ব্যভিচার সংঘটন। কারণ, এ সব দৃশ্য দেখে যুবক-যুবতীরা যে প্রভাব পায় তাতে উভয়ের মনেই সঙ্গীর খোঁজ থাকে। কোন সঙ্গী পেলে সীনের অনুকরণ চলে এবং সেই দর্শন স্মৃতি জাগরিত করে কামতৃষ্ণা নিবারণ করা হয়।

❁ এডাল্ট সীন বা নীল ছবি দর্শনের সময় যে অবস্থা হয় তা বলাই বাহুল্য। উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কত যে ব্যভিচার, সমকাম, মাহারেমের উপরও হামলা, হস্ত মৈথুন এবং বহুবিধ অসঙ্গত যৌনাচার ঘটে থাকে এই সর্বনাশী, চরিত্র বিধ্বংসী চিত্রে তা বহু মানুষই শুনে এবং পড়ে থাকবে!

❁ নির্লজ্জ ও প্রগল্‌ভ নৃত্যগীত যা রুচিবান মানুষকে লজ্জা দেয়। যা নীচতা ও হীনতায় যুবকদেরকে প্রবুদ্ধ করে অশ্লীলতা ও নোংরামীতে ফেলে।

❁ হাস্য-কৌতুক বা কমিডি ফিল্ম দর্শনে মানুষের মনে গাম্ভীর্যহীনতা, কৌতুকতা ও টিটামীর জন্ম হয়। তাছাড়া অধিক হাস্যতে অন্তরও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে।

❁ এক পরিবারে একই পর্দার সম্মুখে পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী একই স্থানে বসে একত্রে এ জাতীয় ছবি, এডাল্ট সীন, ডিস্কো ড্যান্স এবং প্রেম

নিবেদনের অভিনয় দেখে থাকে! যা নেহাতই নির্লজ্জতা ও নীচ চরিত্রের পরিচায়ক এবং নিদারুন বেদনাব্যঞ্জক মুসলিম পরিবার ও সমাজের জন্য!

❁ ছেলে-মেয়েদের চরিত্রের সাথে পড়াশুনারও প্রচুর ক্ষতি সাধন হয় এই প্রিয়তমার অভিসারে।

ইবাদতগত অপকার :

❁ সময়ে নামায পরিত্যাগ করা হয়, নামাযে অমনোযোগ আসে এবং প্রোগ্রামের প্রতি মন আকৃষ্যমান থাকে। প্রোগ্রাম দেখার পর নামায পড়লেও নামাযের মাঝেই প্রোগ্রাম সম্পর্কিত আন্তরিক পর্যালোচনা, বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে বিচার ও বিবেকে মানসিক আন্দোলন, ঘটনার বিভিন্ন প্রতিচ্ছবির মনে প্রভাব ও প্রতিফলন ঘটে। ফলে তার নামায 'নামজ' হয়ে রয়ে যায়। আর এমন নামাযীর জন্য ওয়াইল। (কুরআন)

❁ ফজরের নামায গুল করা হয়। কারণ, টি,ভির প্রোগ্রাম দর্শনে অধিক রাত্রি জাগরণের ফলে কার সাধ্য ফজরে গাত্রোত্থান করে?

❁ রোযাদার দর্শকের রোযার ফল নষ্ট হয় এই অবৈধ অশ্লীল ফিল্ম্ দর্শনে।

❁ পর্দা, একাধিক বিবাহ, তালাক প্রভৃতি বর্বরতা ও কুসংস্কাররূপে প্রদর্শিত হয়। যাতে থাকে অসঙ্গত পরিহাস ও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

❁ ধর্মীয় পণ্ডিত বা ধর্মপ্রাণ মানুষকে এমন মোল্লা ও গোঁড়ার চরিত্রে দেখানো হয়, যাতে সত্য সত্যই তাদের প্রতি দর্শকের মনে অভক্তি, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে।

❁ বিজাতির চালচলন মুসলিমদের মাঝে বিস্তারলাভ করে। দর্শনে চোখের ব্যভিচার হয়, মনের অবৈধ কামনা ও সাধ বাড়ে। নারীর পরপুরুষ এবং পুরুষের পরনারীর প্রতি কামদর্শন এবং তাদেরকে নিয়ে গর্ব করা হয়। চোখের তৃপ্তি ও মনের অবৈধ স্বাদ অনুভব করা হয়; যা শরীয়তে সম্পূর্ণ অবৈধ। তাছাড়া ছবির সাথে অবৈধ গান-বাজনাও শুনতে হয় যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

ঐতিহাসিক অপকার :

❁ সাধারণতঃ অভিনীত নাট্য ও ফিল্মে অধিকাংশ অতিরঞ্জিত ও কল্পিত বিষয় হয়ে থাকে। কিন্তু কল্পনার কলে কত যে ইতিহাস বিকৃত করা হয়, তা ঐতিহাসিক ছাড়াও যারা ইতিহাস পড়েন তাঁরা জানবেন।

❁ ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করা হয়। তার গর্বের ইতিহাসকে খর্ব করে অথবা ধামাচাপা দিয়ে কলঙ্কের ইঙ্গিতবহ ইতিহাস প্রচার ও প্রদর্শন করা হয়।

❁ প্রকৃত অত্যাচারীকে অত্যাচারিত এবং তার বিপরীত প্রদর্শিত হয়।

❁ কল্পনার কলে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করার চেষ্টা করা হয় এবং এই সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক ছবি দর্শনের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

۞ ঐতিহাসিক ফিল্মে সাহাবা, তাবেয়ীন ও উলামাগণের মহান চরিত্র অভিনয় করে দুশ্চরিত্র কাফের, ফাসেক অভিনেতা এবং সাধ্বী, মহীয়সী ও গরীয়সী মুসলিম নারীর চরিত্রাভিনয় করে একজন কাফের বা ভ্রষ্টা মেয়ে! যাতে তাঁদের সেই মহান চরিত্র ওদের অভিনয়ে অনেকাংশে কলঙ্কিত ও ত্রুটিযুক্ত হয়! বিকৃত হয় তাঁদের আসল চরিত্র!

মানসিক অপকার :

۞ গুলাগুলি, কাটাকাটি, মারামারি, খুনাখুনি প্রভৃতি ফাইটিং চিত্র দর্শনে মনে নৃশংসতা, কঠোরতা, শত্রুতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ম হয়।

۞ ভৌতিক, হিংস্র ও কাল্পনিক জন্তু-সম্বলিত বা ইচ্ছাধারী নাগ-নাগিনীর ছবি দেখে মনে মনে অনেকের (বিশেষ করে শিশুদের) অত্যন্ত ভয় জন্মে। যার ফলে স্বপ্নে ও জাগ্রতাবস্থায়ও মানসিক কষ্ট ও ভয় পেয়ে থাকে।

۞ কাফেরদের বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ, অস্ত্রভাণ্ডার ও পরাশক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করে মুসলিমরা মানসিক পরাজয়ের স্বীকার এবং হীনাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে মনে মনে ভীতির সঞ্চার হলে নিজেদেরকে চিরদিনের জন্য পরাভূত এবং কাফেরদেরকে চিরপরাক্রান্ত ভেবে নিজেদের বিজয়কে সুদূরপরাহত ধারণা করে। মুসলিমদের দেশ ও সমাজ আভ্যন্তরীণরূপে বিদেশ ও বিজাতি কর্তৃক মানসিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে পড়ে।

۞ বিভিন্ন অবাস্তবিক কারটুন বা ব্যঙ্গচিত্র দর্শনে শিশুদের মনে কেমন এক অবাস্তব জগৎ রচিত হয়। অনেক সময় শিশুরা সেই অবাস্তব খেয়ালী জগতে বিচরণও করতে চায়।

স্বাস্থ্যগত ক্ষতি :

۞ চিত্রপটে অনিমিখ দৃষ্টি-নিক্ষেপে চক্ষুর ধারণাতীত ক্ষতি হয়। অথচ চক্ষু মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া এক বড় সম্পদ। যার সম্বন্ধে কিয়ামতে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।

۞ ভীতি সঞ্চারক, হৃদয়বিদারক ও রক্তক্ষয় বিষয়ক কাহিনীর ছবি দর্শনে হার্টের রোগীদের হার্টের চাপ বৃদ্ধি ও অন্যান্য স্নায়বিক রোগের সৃষ্টি হয়।

۞ অধিক রাত্রি জাগরণ ও অনিদ্রার ফলেও শারীরিক ক্ষতি হয়।

আর্থিক ক্ষতি :

টি,ভি ও তার সাজ-সরঞ্জাম, এন্টেনা, বা ডিস এন্টেনা, ভি,সি,আর, ক্যাসেট ইত্যাদি খরিদ করতে এবং তা চালাতে ব্যাটারী বা বিদ্যুতের এবং অচল হলে তার মেরামতে যে অপরিমিত অর্থ ব্যয় হয় তা সকলের বিদিত। যে অর্থ ও মাল সম্পর্কেও কিয়ামতে মানুষকে কৈফিয়ত করা হবে। দূরদর্শনের প্রচার ও এ্যাডভার্টাইজ্ম্যান্টে বহু অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র-বস্তু ক্রয় করতে মেয়েরা যে প্রতিযোগিতা লাগায়, তাতেও অনর্থক বহু পয়সা নষ্ট হয়ে থাকে।

কোন গৃহস্বামী বলতে পারেন, 'আমি যদি এ সমস্ত ক্ষতি ও অপকারকে এড়িয়ে চলি, তবে কি অন্যান্য উপকারের জন্য তা ব্যবহার বৈধ হবে না?'

জি হ্যাঁ, তাও হতে পারে। আপনার অবর্তমানে যদি আপনার পরিবার-পরিজনও আপনার মত এড়িয়ে চলে তবে। কিন্তু দেখেন যেন, লাভ করতে গিয়ে পুঁজি হারিয়ে না ফেলেন। পাপের এ ছিদ্রপথে মহাপাপ গৃহে প্রবেশ না করে এবং তা পরিবার সহ প্রতিবেশীর আরো অনেকের ভ্রষ্টতার কারণ না হয়।

টেলিফোন

দূরালাপ ও দূরভাষের জন্য এটাও একটি পরিবারের পক্ষে বড় হিতকর যন্ত্র। যা সময় উদ্বৃত্ত করে, দূরকে নিকট করে এবং পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত হতে আপনজনের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেয়।

এই যন্ত্রকে নেক কাজেও ব্যবহার করা যায়। যেমন, ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করা, দূরবাসী মুফতী সাহেবকে শরয়ী প্রশ্ন করা ও ফতোয়া গ্রহণ করা, আত্মীয়তা জাগরিত রাখা, উপদেশ দেওয়া ও নেওয়া, কত বিপদের সময় যথাস্থানে সহযোগিতা চাওয়া ইত্যাদি।

কিন্তু যথা সময়েই এ যন্ত্র আবার একাধিক ক্ষতি ও খারাবির মাধ্যম। এই টেলিফোনই কত লোকের সংসার ভেঙ্গেছে। কত লোকের গৃহে আপদ ডেকে এনেছে। কত নারী-পুরুষকে ফাসাদ ও কুকর্মের পথে নামিয়েছে, তা হয়তো (আমাদের দেশে) অনেকেই জানে না। দূরালাপের খুবই সহজলভ্য এই যন্ত্রখানিতে অনেক সর্বনাশ ঘটে।

۞ এর সাহায্যেই অন্তঃপুরিকা অন্দর মহল হতেই প্রণয়ের বাঁশী বাজায়। এরই দ্বারায় পরিচয়, প্রেমালাপন, সাক্ষাতের ওয়াদাদান, অভিরতি ও অভিসার প্রকাশ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

۞ অজ্ঞাত-পরিচয় খল ব্যক্তি ও শত্রুরা এরই মাধ্যমে দাম্পত্যে ও পরিবারে ভাঙ্গন ধরায়। চুগলখোর ও গীবতকারীরা হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্যবশে সোনার সংসারে আগুন লাগায়।

۞ অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় (অধিকাংশ মহিলাদের তরফ থেকে) দূরবর্তী আত্মীয়ের সাথে আলাপে অনর্থক সময় ও অর্থ ব্যয় করা হয়।

অবশ্য গৃহস্বামী সতর্ক হলে এবং পরিবারকে ঈমানী তরবিয়ত দিয়ে থাকলে ভয় ততটা থাকে না।

গৃহে মূর্তিও ছবি

এমন বহু আসবাব-পত্র বা লেবাস-পোশাক আছে যাতে অনেক বাতিল মাবূদের মূর্তি বা ছবি অঙ্কিত থাকে। গৃহকর্তাকে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে এমন আসবাব কেনা না হয়। অথবা কোন বস্তুতে কোন ছবি বা বাতিল দ্বীনের কোন প্রতীক থাকলে তা যেন নষ্ট করে দেওয়া হয়। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ স্বয়ং এইরূপ করেছেন এবং হযরত আলীকে করতে আদেশ করেছেন। (বুখারী ১০/৩৮৫)

অনেক গৃহস্বামী গৃহ সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে দেওয়ালে কোন জীবের ছবি আঁকে।

নববর্ষের নতুন ক্যালেণ্ডার দ্বারা বৈঠকখানা সজ্জিত করে; যাতে কোন দেবতা, হিরো-হিরোইন বা অন্যান্য মানুষ বা জীবের ছবি থাকে। যথাস্থানে কোন পশু বা পক্ষীর মূর্তি ইত্যাদি স্থাপিত করে মনের মত করে কক্ষ সাজিয়ে থাকে। অথচ ইসলামী অনুশাসনে জীবের মূর্তি বা ছবি অবৈধ। অনুরূপভাবে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ফটোগ্রাফের ছবিও নিষিদ্ধ।

অনেকে বিবাহলগ্নে নবদম্পতির ছবি, মৃত পিতামাতার বা গুরুজনের ছবি দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে। এতে আর একপ্রকার গোনাহের আশঙ্কা থাকে; তা এই যে, যার ছবি তার প্রতি তা'যীম থাকায় শির্ক হতে থাকে। অনেকে তার সামনে করজোরে সালাম জানায়, আশির্বাদ ও সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। যা মূর্তিপূজার মূল সূত্র এবং তাই হয়েছিল হযরত নূহ عليه السلام-এর যুগে।

এতদ্ব্যতীত অন্ততঃপক্ষে মৃতের ছবি লটকানোতে পরিবারে নব-নব শোকের ছায়া লম্বা হতেই থাকে। অথবা ছবি দেখে বাপ-দাদা নিয়ে গর্ব ও দর্প করে ঝুটা আভিজাত্যের জগতে বাস করে থাকে।

অথচ রসূল ﷺ বলেন, "যে বাড়িতে মূর্তি বা ছবি থাকে, সে বাড়িতে (রহমতের) ফিরিশতা প্রবেশ করেন না ।" (বুখারী ৪/৩২৫)

অনেকে বাড়িতে সাজ-সজ্জার জন্য কুরআনী আয়াত দর্শনীয়ভাবে লিখে ও বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে থাকে অথবা কাবা শরীফ, মসজিদে নববী (বিশেষ করে সবুজ গম্বুজ) বা কোন মাযারের ছবি বর্কত ও ইষ্টলাভের আশায় দেওয়ালে লটকিয়ে থাকে যা ইসলামী আইনে বৈধ নয়।

সাজ ও সৌন্দর্যের জন্য মসজিদসমূহের ছবি (তাযীমের উদ্দেশ্যে নয়) গাছ-পালা ফুল-ফল, লতা-পাতা, নদী-হ্রদ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি নির্জীব ও জড় বস্তুর দৃশ্য (বিজাতীয় প্রতীক না হলে) টাঙ্গানো যায়।

অবশ্য অনেকে যে জীবের ছবি বা মূর্তিকে (পুতুলকে ছেলেদের হাতে) পায়ে বা পাছায় দলিত অবহেলিত ও অপদস্থ করা হয়, তা ব্যবহার বৈধ বলেছেন। তবে তাতে অশ্লীল বা কোন বিধর্মীয় প্রতীক থাকলে তাও অবৈধ।

গৃহে মাদকদ্রব্য

বাটীর পরিবেশকে কামজ দোষ, রোগজীবাণু ও দুর্গন্ধাদি হতে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে যাবতীয় মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও শাসন জারী করা এবং কোন প্রকার মাদকদ্রব্য (যেমন, হিরোইন, মদ, তাড়ি, আফিম, ভাং, সিদ্ধি, গাঁজা, হুঁকা, বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, তামাক, খৈনী, জর্দা, গুল, গোরাকু প্রভৃতি) এবং অন্যান্য অনুপাদেয় খাদ্য-পানীয় বস্তু যেন বাড়ির কোন সদস্য ব্যবহার না করে, সে ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান হওয়া গৃহকর্তার এক ওয়াজেব।

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার এ বাণী প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা হতে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?" (সূরা আল মায়েদাহ (৫) : ৯০-৯১)

মাদকদ্রব্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ। যা ইসলামী শরীয়তে হারাম ও অবৈধ। সামাজিক অবক্ষয় ও অধোগতির নিদর্শন। যেহেতু এই মাদকদ্রব্য সেবনে হৃদয়, মন, দেহ, চরিত্র এবং শালীনতায় অগণন ক্ষতি ও বিকৃতি বিদ্যমান।

আর এ জন্যই মদ্যাদি ব্যবহার করা এমন কি ইসলামের প্রাক্কালীন জাহেলিয়াতের যুগেও ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় ছিল।

সারা বিশ্বের সমাজ বিজ্ঞানীরাও এতে একমত যে, মদ্যপান মানবতার এক বড় শত্রু ও আততায়ী। যেহেতু মদ যাবতীয় অখাদ্যের প্রধান, সকল অনাচারের মূল, সমস্ত বিপদ ও অপরাধের মস্তক। যার ক্ষতি আত্মা, হৃদয়, দেহ, মন, সম্পদ, সন্তান, সম্ভ্রম ও ইজ্জতে ব্যাপক হয়। এই মদ কত গৃহকে বরবাদ করেছে, কত স্থাবর সম্পত্তিকে বেহাত করেছে, কত ফিতনা ও বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করেছে, কত কঠোরতা ও বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে! মদের মধ্যে ভীরু সাহস খোঁজে, দুর্বল শক্তি খোঁজে, দুঃখী সুখ খোঁজে, জ্বালাময় সংসার-চিন্তা হতে মুক্তি পেয়ে অধৈর্য মানুষ ক্ষণিকের শান্তি খোঁজে, কামুক খোঁজে অতিরিক্ত যৌনশক্তি, সুখী খোঁজে অতিরিক্ত সুখের আমেজ, কিন্তু প্রত্যেকেই অধঃপতন ছাড়া কিছুই পায় না।

এই সেই মদিরা যে মস্তিষ্ককে চিন্তা, গবেষণা, প্রজ্ঞা, যুক্তি, বোধ ও উপলব্ধি হতে উন্মাদনা, মত্ততা, উদ্বিগ্নতা ও বিশৃঙ্খলতার প্রতি স্থানান্তরিত করে! এই সুরা কত রাজার রাজ্য হারিয়েছে, কত সতীর সতীত্ব লুটিয়েছে! ভায়ে-ভায়ে পিতা-পুত্রে ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কলহ ও বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়েছে এই মদ্য! কত বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করেছে এবং কত ঐক্যকে ধ্বংস করেছে এ সর্বনাশী মদিরা! যা নিঃস্ব পান করলে নিজেকে কোন সিংহাসনে আসীন রাজা ভাবে, ভীরু পান করলে নিজেকে বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে ধারণা করে, নির্বোধ পান করলে নিজেকে সুতীক্ষ্ম বুদ্ধিমান মনে করে, মূর্খ পান করলে নিজেকে সবার চেয়ে পণ্ডিত ভেবে থাকে! মদোন্মত্ততায় মদ্যপ নিজের মাতা-ভগিনীকেও উপভোগ্য কামিনী ভেবে বসে! এ্যালকুহল মদ্যপায়ীর বিশেষ ক্ষতি সাধন করে ও রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে তার স্বাস্থ্যহানি হয় এবং শেষে প্রাণহানিও। মদ্যপান তার জীবনে লাঞ্ছনা ডেকে আনে। হয়তো বা কারাগারে জীবন কাটাতে হয়। পরিবার পরিজনের জীবনে ভীষণ দুর্দশা নেমে আসে! অভ্যাসী হয়ে গেলে তার এক বিন্দু অর্জন করার লক্ষ্যে নিজের সবকিছু; অর্থ, মান ও প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়! মদ তাকে লম্পট, কামুক ও ব্যভিচারী বানায়, লুটেরা ও খুনী করে তোলে! পথের কুকুর তার মুখে মুতে!

অনুরূপভাবে ধূমপানও গৃহ ও সমাজের জন্য এক বড় আপদ। যা হিজরীর দশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং তৎকালীন উলামাগণ একে হারাম ঘোষণা করে মুসলিমকে সতর্ক করেন। যেহেতু এই (গাঁজা প্রভৃতির) ধূমপান মানুষকে নেশাগ্রস্ত ও অজ্ঞান করে ফেলে। ধূমপায়ীকে নেশাগ্রস্ত না করলেও অধূমপায়ীকে করে ফেলে অথবা এর কিছু কিছু পরিমাণ জ্ঞানশূন্য না করলেও অধিক পরিমাণ করে থাকে।

রসূল ﷺ বলেন, “মদ যা মাদকতা (মত্ততা বা নেশা) আনে এবং জ্ঞান বিলুপ্ত (বেহুশ) করে ফেলে।”

তিনি প্রত্যেক নেশা, মত্ততা, দুর্বলতা, জড়তা আনয়নকারী এবং চেতনা ও জ্ঞান স্তিমিতকারী বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। (আবু দাঊদ)

তিনি বলেছেন, “যে বস্তুর আধিক্য নেশাগ্রস্ত (বেহুশ) করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।” (মুসলিম, আহমদ)

(বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতির) ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এ কথা ধূমপায়ীরাও স্বীকার করে এবং ধূমপান-সামগ্রীর সম্প্রচারেও (প্যাকেট ইত্যাদিতে) স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত থাকে। ডাক্তারগণ এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, ধূমপান হার্ট, রক্তপ্রবাহ, বক্ষ এবং সারা দেহের জন্য ক্ষতিকর। রক্তনালী সংকীর্ণ ও বন্ধ করে ফেলে। শরীরে কফ জন্মায়। টি,বি, ক্যানসার প্রভৃতি রোগের সূত্রপাত হয় এই ধূমপান হতে।

সুতরাং যখন এ কথা প্রমাণিত যে, তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তখন নিঃসন্দেহে সকলের মতে তা হারাম।

যেহেতু মানুষ নিজের দেহের মালিক নয়। তাই শরীয়তের অনুমতি ছাড়া তার দেহের কোন প্রকার অপব্যবহার করতে পারে না। আত্মহত্যা করতে পারে না এবং এমন বস্তু ব্যবহারও করতে পারে না; যা সত্বর অথবা বিলম্বে ধীরে ধীরে মরণ ডেকে আনে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}

“এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।--” (সূরা আন-নিসা (৪) : ২৯)

{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ}

“তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না” (সূরা আল-বাক্বারাহ (২) :১৯৫)

ধূমপানে নিরর্থক সম্পদ ও অর্থের অপচয় হয়। অথচ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

{وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}

“তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না, যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই।” (সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ২৬-২৭)

আল্লাহর নবী ﷺও অর্থ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কথা বিদিত যে, ধূমপায়ী ধূমপানের পেছনে প্রতি সপ্তাহে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করে থাকে। যার বাৎসরিক খরচ মোটা অঙ্কের হয়ে দাঁড়ায় অথচ তাতে তার কোনও লাভ হয় না। সে ধূমপানকে বহু কিছু দান করে থাকে, কিন্তু ধূমপান তাকে (ক্ষতি ছাড়া) কিছুই দেয় না।

সুতরাং এতে অযথা অর্থব্যয় প্রমাণিত হলে এদিক দিয়েও তা অবৈধ হবে। যেমন যদি কোন মানুষ নিজের সঞ্চিত অর্থনোটে আগুন ধরিয়ে অনর্থক নষ্ট করতে চায়, তবে সকলের মতে তা তার জন্য হারাম; তেমনি ধূমপানের ক্ষেত্রেও। যেহেতু তাতে কোনও উপকার নেই, উল্টে অপকার আছে। আর শরীয়তে সেই বস্তু মাত্রই ব্যবহার অবৈধ যা মানুষের ঈমান, প্রাণ, মান, জ্ঞান বা ধনের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করে।

ধূমপান সামগ্রী উপাদেয় আহার্য বা পানীয় নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর আম্বিয়া ও নেক বান্দাদেরকে উপাদেয় ও পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন। যা কুরআন মাজীদের একুশটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ...}

“হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর।--” (সূরা বাকারাহ (২) : ১৭২)

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ....}

"যে (নিরক্ষর রসূল) তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তু বৈধ করে এবং অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তু অবৈধ করে----। (সূরা আল-আ'রাফ (৭) : ১৫৭ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা এখানে খাদ্য ও পানীয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, যার কোন তৃতীয় নেই। প্রথম প্রকার খাদ্য পবিত্র, উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় এবং দ্বিতীয় প্রকার অপবিত্র, নিকৃষ্ট ও অনুপাদেয়। প্রথম শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয়কে বৈধ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু তা যে, অপবিত্র ও নিকৃষ্ট তা কি রূপে মানা যায়? যদি কোন সুস্থ-প্রকৃতির এবং মাঝারি মেজাজের মানুষকে সালিস মেনে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বিড়ি-সিগারেট পবিত্র ও উৎকৃষ্ট অথবা তার বিপরীত? তবে নিঃসন্দেহে সে উত্তর দেবে যে, তা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট। যেহেতু তার স্বাদ উগ্র এবং গন্ধও নিকৃষ্ট। ধূমপায়ীর মুখ হতে যে দুর্গন্ধ নির্গত হয় তা যারা ধূমপান করে না, তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলে। যে কথা ধূমপায়ী নিজের প্রিয়তমা (অধূমপায়ী) স্ত্রীর নিকট হতে অবশ্যই জেনে থাকে। পরন্তু এই ধূমপান সাধারণতঃ তারাই করে, যারা ততটা ধার্মিক এবং সচ্চরিত্রের মালিক নয়।

পায়খানা ও নোংরাস্থানে ধূমপায়ীরা (পায়খানা করতে করতেও) ধূমপান করে থাকে; কিন্তু তাদের কেউই মসজিদের ভিতর ধূমপান করে না। ইমাম সাহেব ধূমাপায়ী (?) হলেও মসজিদ ছেড়ে অন্য স্থানে ধূমপান করে থাকেন। যেহেতু যেদিন হতে ধূমপানের জন্ম সেদিন হতেই মসজিদের পবিত্রতা ও মর্যাদা খেয়াল করে কেউ তা নষ্ট করতে দুঃসাহস করে না। অথচ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিমরা প্রয়োজনে মসজিদের ভিতর পানাহার করে থাকে; কিন্তু ধূমপান করার সাহস কেউ করে না। যা এই কথারই দলীল এবং বড় সবুত যে, ধূমপান সামগ্রী পবিত্র ও উৎকৃষ্ট নয়। বরং তা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট।

ধূমপান অহিতকর বলেই অফিস ট্রেন, ট্রাম ও বাস ইত্যাদিতে **No Smoking** বা 'ধূমপান নিষিদ্ধ' বলে স্পষ্ট লেখা থাকে। অমুসলিম হয়েও রুচিশীলতার পরিচয় দিয়ে ধূমপান হতে অনেকে সাবধান থাকে; কিন্তু মুসলিম হয়েও সে রুচিশীলতার পরিচয় অনেকেই দেয় না।

বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত শেষ টুকরা কত বড় বড় কারখানা ও স্থাবর সম্পত্তি জ্বলে ভস্ম হবার কারণ হয়, তা জেনেও জ্ঞানীকে সাবধান হওয়া উচিত।

বিড়ি-সিগারেট হারাম হওয়ার জন্য এতগুলি দলীল কি জ্ঞানীর জন্য যথেষ্ট নয়? অনেকে বলে, এটা সন্দিগ্ধ বস্তু। এত দলীল পেশ করা সত্ত্বেও যদি তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করে, তবে তার উচিত রসূল ﷺ-এর এই উক্তি মনে রাখা, যাতে তিনি বলেন, "অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে

এবং যে ব্যক্তি সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে আপতিত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

অনেকে বলে থাকে যে, 'বিড়ি-সিগারেট পান করা মকরূহ। হারাম হলে কুরআনের কোন আয়াতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকত; যেমন রক্ত, শুকর, মৃত প্রাণী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষিত আছে।'

আপনি তাকে বলুন, 'তুমি যে ভাত-মুড়ি, আম-জাম প্রভৃতি খাও; তা হালাল না হারাম?'

সে নিশ্চয়ই বলবে, 'হালাল।'

আপনি বলুন, 'কিন্তু ভাত-মুড়ি, আম-জাম যে হালাল সে ব্যাপারে আল্লাহ তো স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন নি; যেমন কতক শ্রেণীর খাদ্যকে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া কুরআন তো কোন খাদ্য-তালিকা গ্রন্থ নয়। কি কি খাওয়া হারাম ও কি কি খাওয়া হালাল স্পষ্টাকারে বলতে হলে তো কুরআনের কলেবর হয়তো ডবল হত।'

সে বলবে, 'এগুলো তো ভালো জিনিস।'

আপনি বলুন, 'আল্লাহ তো ভালো জিনিস হালাল আর মন্দ জিনিসকে হারাম করেছেন। তবে বিড়ি-সিগারেট হারাম কেন নয়?'

সে হয়তো তখন চট্ করে বলবে, 'বিড়ি-সিগারেট তো ভালো জিনিস। আমাদের নিকটে তো তা খারাপ নয়।'

তখন আপনি বলুন, 'তাহলে তোমার ৬/৭ বছরের ছেলেটাকেও ধূমপান করা শিখিয়ে দাও।'

এখন সে সুস্থ মস্তিষ্কের হলে নিশ্চয় বলবে, 'তা কি করে হয়?'

আপনি বলুন, 'তাহলে তুমি স্বীকার করছ যে, তা ভালো জিনিস নয়।'

পরিশেষে দেখবেন সে চুপ থাকবে।

পক্ষান্তরে মকরূহ হলেও বিড়ি-সিগারেট সেই অর্থে মকরূহ যে অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৮নং আয়াতে শির্ক থেকে নিয়ে বিভিন্ন কবীরা গোনাহকে মকরূহ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং জ্ঞানী সতর্ক হবেন কি?

গৃহে কুকুর পালন

আমাদের মাঝে কাফেরদের যে সব অভ্যাস ও শৌখিনতা অনুপ্রবেশ করেছে তন্মধ্যে কুকুর পালন অন্যতম। তাই বহু এরূপ সৌখিন গৃহকর্তাকে দেখা যায় যে, মোটা টাকা ব্যয় করে কুকুর খরিদ করে শখের সাথে বাড়িতে রেখেছে (অথচ কুকুরের মূল্য হারাম) (আঃ ১/৩৫৬) এবং তার খাদ্যে ও পরিচ্ছন্নতায় বহু পয়সা খরচ করেছে।

(যে পয়সা বিষয়ে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে।) এমনকি কুকুর পালন বিভবশালী ও পদস্থ চাকুরীজীবির এক গৃহ-প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

কুকুরের লালা অপবিত্র। অথচ কুকুর তার প্রভুর দেহ-পদ লেহন করে, গৃহে খানপান পাত্র ও বাসনাদি চেঁটে বেড়ায়। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসনে (তাতে রোগ জীবাণু ও অন্যান্য ক্ষতি আছে বলেই) বলা হয়েছে, "কুকুর কোন পাত্র লেহন করে থাকলে পাত্রটিকে একবার মাটি দ্বারা (মেজে-ঘষে) ছয় বার পানি দ্বারা ধৌত কর।" (আদাঃ)

আবার দেখা যায় সেই কুকুরের সাথে ছেলেমেয়েরা খেলা করে; এমনকি অনেকের বিছানায়ও তার স্থান হয়! অথচ পাগল অথবা কালো কুকুর দ্বারা বড় ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। হাদীসে কালো কুকুরকে শয়তান বলা হয়েছে এবং তাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে গৃহে কুকুর পালিত হয় সে গৃহবাসীর আমল (সওয়াব) হতে প্রত্যহ এক অথবা দুই 'ক্বীরাত' (এক প্রকারের মাপক) কম হতে থাকে। তবে শিকার ও খেত বা গবাদি পশুর পাহারার কাজে ব্যবহার করা যায়।" (তিরমিযী ১৪৮৯নং)

অনুরূপভাবে বাড়ি পাহারার জন্য, অপরাধী চিহ্নিত করার জন্য এবং গুপ্ত মাদকদ্রব্য, মৃতদেহ প্রভৃতি উদ্ধারের জন্যও প্রশিক্ষিত কুকুর (যথাস্থানে) রাখা বৈধ।

অতএব চোরের খবর জানতে পাহারাদার অথবা শিকারী কুকুর যদি গৃহস্বামী জরুরী মনে করে, তবে সে যেন এ আদবগুলি খেয়াল রেখে তার নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচিত করে পালন করে। পরিবারের ভোজন ও শয়ন কক্ষে যেন প্রবেশ না করে। কারণ, যে গৃহে কুকুর থাকে, সে গৃহে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না। (সহীহুল জামে ৬৮নং)

প্রকাশ থাকে যে, বিড়ালের লালা বা মুখ দেওয়া খাদ্য-পানীয় অপবিত্র নয়। (আহমাদ ৫/৩০৯)

কিন্তু সুবহানাল্লাহিল আযীম, যেখানে মানুষ রুটির অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে সেখানে কুকুর ও বিড়াল বড় আদর-যত্ন ও বিলাসের সাথে পালিত হচ্ছে! যেমন যেখানে মানুষ নগ্নাবস্থায় শীতে কষ্ট পাচ্ছে সেখানে কবরের উপর মূল্যবান চাদর চড়ানো হচ্ছে!!

বিলাসিতা

বহু গৃহেই সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার নামে বিলাসিতা এসে পড়েছে। প্রচণ্ড সুখভোগে উন্মত্ত হয়ে, পার্থিব জীবনে ধ্যান ও দিয়ে ইচ্ছা-শান্তির উপায়-উপকরণ খুঁজে চলেছে মানুষ। মনোহর বিলাস-সামগ্রীতে মানুষ প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। দ্বীন পালনের মাঝে বেহেশত লাভের ভরসা না করে নিজ কর্মের মাঝে স্বরচিত স্বর্গের আশা করছে।

তাই তো সৌন্দর্যবহুল কোন কোন গৃহে প্রবেশ করলেই ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তিটি স্মরণে আসে। 'নাম ব্যতীত পৃথিবীর কোন বস্তুই জান্নাতে নেই।' (সহীহুল জামে ৫৪১০নং) জান্নাতে যা আছে, তা তো মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

গৃহে যে সমস্ত মনোহারিত্ব, সৌন্দর্য, নকশা ও কারুকার্যতা প্রভৃতি পাওয়া যায় তার উল্লেখ না করে এ বিষয়ে কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (٣٤) وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ}

"কুফরীতে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে এ আশঙ্কা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) তিনি দিতেন ওদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত সোপান ও গৃহদ্বার, বিশ্রামের জন্য পর্যঙ্ক এবং সৌন্দর্যালঙ্কার। কিন্তু এসব তো পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। সাবধানী (মুত্তাকী)দের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পরকালের কল্যাণ।" (সূরা আয-যুখরুফ (৪৩) : ৩৩-৩৫)

সুতরাং পার্থিব জীবনের অধিক সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যাদি তো আল্লাহর তরফ হতে কাফেরদের জন্য প্রদেয়। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে সবটুকু প্রদান করলে অজ্ঞ মানুষ এই ধারণা করবে যে, কাফেররা ঐশ্বর্য পেলে কুফরীতেই ধনলাভ হয়। ধর্ম করলে কাঁদতে হয়। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ও সদয় বলেই তো তাদেরকে এত বিভব প্রদান করেন। অতএব ধর্মে কিছু নেই। ফলে কুফরীতেই মানুষ মেতে উঠত।

অথচ বিভব-সম্পদ তাদেরকে ফিতনার জন্যই দেওয়া হয়। তিনি মুসলিমকে ফিতনায় ফেলতে চান না। তিনি মুমিনের জন্য আখেরাতকেই পছন্দ ও নির্ধারিত করে রেখেছেন। তবে পার্থিব সুখভোগ ও সৌন্দর্যকে তাদের জন্য একেবারে অবৈধ করেননি। (সূরা আল-আ'রাফ (৭) : ৩২) কিন্তু এতে অতিরঞ্জন করা ও উন্মত্ত হওয়াকে পছন্দ করেননি। তাইতো তাঁর প্রিয় দূত ﷺ দেওয়াল-গাত্রে পরদা দেখলে ছিঁড়ে ফেলতেন। (মুসলিম) দরজায় মূল্যবান সৌন্দর্যখচিত পরদা দেখলে সে গৃহে প্রবেশ করতেন না। (আহমাদ ৫/২২১) সাহাবায়ে কেরামগণও কোন বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে প্রবেশ করে যদি সৌন্দর্য ও বাহারের আতিশয্য দেখতেন, তবে সে গৃহে প্রবেশ না করেই ফিরে আসতেন এবং কিছুও ভক্ষণ করতেন না। (ফতহুল বারী ৯/২৪৯)

মোটকথা গৃহকে অতিশয় সৌন্দর্য ও বাহারে সুশোভিত করা মকরূহ অথবা হারাম। কারণ, তাতে অপব্যয় হয় এবং পার্থিব জীবনের উপর চিত্তাকৃষ্ট হয়।

অতএব গৃহস্বামীর উচিত, সর্বদিক বজায় রেখে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা। অবশ্য এ কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, ইসলামে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সুন্দরতা বাঞ্ছিত ও ঈপ্সিত কর্ম। তবে তাতে বাড়াবাড়ি করে অর্থের অপচয় করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দিত অপকর্ম। মুসলিমের যা উচিত তা এই যে, সে পরিবেশকে সুন্দর ও রুচিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য গৃহাঙ্গন, বহির্বাটি ও বাড়ির বহির্দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই রাখবে। খেয়াল রাখবে, যাতে কোন প্রকারের আবর্জনা ও ময়লাদি তার ব্যক্তিত্ব ও বাড়িতে কলঙ্ক না এঁকে দেয়। যেহেতু এই বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা বাইরের লোকেদের জন্য তার সুন্দর পরিবেশরচিত বাড়ির শিরোনাম এবং তার ভদ্রতা ও ধর্মনিষ্ঠার অভিব্যক্তি।

পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহের আঙ্গিনা (সম্মুখভাগকে) পরিচ্ছন্ন রাখ। কারণ, সবচেয়ে নোংরা আঙ্গিনা হল ইয়াহুদীদের আঙ্গিনা।" (সহীহুল জামে ৩৯৪১নং)

অর্থাৎ, বাড়ির সম্মুখভাগকে অপরিষ্কার করে রাখা কোন মুসলিমের কাজ নয়। সে কাজ হল ইয়াহুদীর।

বৃক্ষ-রোপনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পরিবেশ-বিজ্ঞানী মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে।" (আহমাদ, সহীহুল জামে ১৪২৪নং)

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "যে কোন মুসলিম গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সদকাহ (করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ) হবে।" (বুখারী ২৩২০নং)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি (খামাখা) কোন কুল গাছ কেটে ফেলবে (যে গাছের নিচে মুসাফির বা পশু-পক্ষী ছায়া গ্রহণ করত), সে ব্যক্তি মাথাকে আল্লাহ সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" (আবূ দাউদ ৫২৩৯নং)

গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা

যদিও মুসলিমের মূল উদ্দেশ্য, আসল বাসস্থান পরকাল, ইহকাল নয়; তবুও পরকালের সেই চিরস্থায়ী সুখের বাসা বাঁধার জন্য ইহকালের অন্য-বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রতি তাকে প্রযত্নবান হতে হয়। তাকে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর লক্ষ্যে পথিমধ্যে রৌদ্র, ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম হতে বাঁচার জন্য মজবুত তাঁবুর সহায়তা নিতেই হয়।

আর সেই তাঁবু এই সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী ঘর। তাই মুসলিম গৃহ নির্মাণের সময় যে বিশেষ খেয়াল রাখে অন্য কেউ তা রাখে না। যদিও পরিকল্পনার সময় তার উদ্দেশ্য

নয়নাকর্ষণ নয়, চিত্তাকর্ষণ। গৃহের বাহ্যিক রূপ নয়, তার প্রাণ। আর তার পরিকল্পনা হয় নিম্নরূপঃ-

১। প্রথমতঃ মুসলিম গৃহের যথোচিত স্থান নির্বাচিত করে। চেষ্টা করে যাতে তার বাড়িটি মসজিদের পাশে হয়। যাতে সে নামাযের আহবান আযান শুনতে পায়। নামাযের জন্য সতর্ক ও জাগ্রত হতে পারে। সহজে জামাআতে শামিল হতে এবং মসজিদের খোতবা ও অন্যান্য ইলমী আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। মহিলারা (লাউডস্পীকারের সাহায্যে) ওয়ায নসীহত শুনতে এবং ছেলেমেয়েরা পড়তে যেতে সক্ষম হয়।

তদনুরূপ মুসলিম খেয়াল রাখে যে, তার বাড়ির প্রতিবেশী যেন কোন কাফের বা ফাসেক না হয়। বাড়ি এমন স্থানে যেন না হয়, যাতে বাইরের কোন স্থান হতে ভিতরে নজর পড়ে।

২। বাড়ির গঠন-প্রণালীতে খেয়াল করে, যাতে পুরুষের মজলিস (বাড়ির ভিতরে ওঠা-বসার সাধারণ জায়গা) এবং মেয়েদের মজলিস ভিন্ন হয়। গৃহের দুটি প্রবেশ পথ হয়। একটি পুরুষদের জন্য ও অপরটি মহিলাদের জন্য। বহিরাগত মেহমানদের জন্য একটি বৈঠকখানা হয়। অন্দর মহল পথে যেন তার একটি দরজা হয় এবং গৃহাঙ্গনের প্রতি যেন তার কোন জানালা না হয়। তারই পাশে একটি খাবার রুম হয়; যাতে মহিলারা খাবার সাজানোর পর মেহেমোনরা বৈঠকখানা হতে এখানে প্রবেশ করে প্রস্তুতকৃত খাবার খেতে অসুবিধা ভোগ না করে, বাড়ির লোকেদের বইতে (গায়ের মাহারেম মেয়েদের পক্ষে পুরুষদের সামনে খাবার দিতে) অসুবিধা না হয় এবং নারীদের মধ্যে যার মাহরাম মেহেমান হবে, সেও সেখানে গিয়ে খাওয়াতে ও কথাবার্তা বলতে পারে। তার পাশেই এমন এক পায়খানা ও তার শামিলে গোসলখানা হয়, যার ছোটছোট দু'টি করে কক্ষ থাকে এবং বিপরীত-মুখী দু'টি দরজাও থাকে একটি বৈঠকখানার পথে অপরটি অন্তঃপুরের পথে। যাতে মেহেমানদের কোন অসুবিধা না হয়। পুরুষরা বাইরের এবং মহিলারা ভিতরের দরজায় ভিন্ন বাথরুম ব্যবহার করতে পারে। অবশ্য পৃথক পৃথক দু'টি বাথরুম করতে পারলে সেটাই উত্তম। তবে এও খেয়াল রাখা উচিত, যাতে প্রস্রাব-পায়খানার সময় কেবলা-মুখ না হয়। যদি ট্রাঙ্কি-নলের পানির ব্যবস্থা না থাকে তবে অন্ততঃপক্ষে একটি কূপ অথবা নলকূপ তৈরি করে নেওয়া বাড়ির ইজ্জতের কাজ। সামনে পুকুরে ঘেরা-বেড়া ঘাট হলেও চলে।

বাড়ির জানালাগুলিকে পর্দা দিয়ে আবৃত করা উচিত। (লোহার ঘন জাল দিলে ভিতরে নজর আসে না অথচ বাতাসও প্রবেশ করে। তবে কক্ষের ভিতরে আলো থাকলে বাইরে থেকে নজর খুব স্পষ্ট পড়বে---তার খেয়াল রাখা জরুরী)। বাড়ির শেষ ছাদের চারিদিক এমন উঁচু করে আড়াল দেওয়া এবং রোয়াক বা বারান্দাকে পর্দাবৃত করা জরুরী, যাতে কোন চোখাচোখি অথবা বেপর্দার ভয় না থাকে। তদনুরূপ এও খেয়াল করা যাতে পাশের বাড়ির কোন জানালা বা বারান্দা হতে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি না আসে।

প্রকাশ যে, কোঠা বা দ্বিতলের জানালা বা বারান্দা এমন হতে হবে, যাতে প্রতিবেশীর গৃহের অভ্যন্তর দৃষ্ট না হয়। জানালা দেওয়ালের (মানুষভর অপেক্ষা) উপর রাখতে হবে নচেৎ কোন কিছু দিয়ে আড় করে দিতে হবে; তাতে বাড়ি পূর্বে করুক অথবা পরে, পার্শ্বের বাড়ি লাগালাগি হোক বা দূরে। আর এরূপ করা ওয়াজেব, না করা হারাম। যেহেতু এতে মুসলিম বাড়ির ইজ্জত প্রকাশ ও নষ্ট হয়। (আল মুন্তাকা মিন ফারাইদিল ফাওয়াইদ,উসাইমীন ৮৪পৃঃ) যেমন গৃহাঙ্গনকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করাও এক ফরয কর্তব্য।

পারতপক্ষে এমন গৃহ নির্মাণ করা উচিত, যা প্রশস্ত ও বহু কক্ষবিশিষ্ট হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তার প্রদত্ত নিয়ামত ও সম্পদের প্রভাব ও চিহ্ন তাঁর বান্দার উপর দেখতে পছন্দ করেন। (তিরমিযী ২৮১৯)

আর আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “সৌভাগ্য ও সুখের বস্তু হল তিনটি এবং দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বস্তু হল তিনটি; (তন্মধ্যে প্রথম হল,) সতী ও পূণ্যময়ী স্ত্রী, যাকে দেখলে (তার সুন্দর স্বভাব-চরিত্রের ফলে) তোমার মন তুষ্ট ও হর্ষোৎফুল্ল হয়। তোমার অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে এবং তোমার সম্পদের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পার। (দ্বিতীয় হল,) তেজস্বী ও শান্ত সওয়ারী (দ্রুতগামী গাড়ি), যা তোমাকে সফরের সঙ্গীদের সাথে মিলিত করে। আর (তৃতীয় হল,) প্রশস্ত ও বহু কক্ষবিশিষ্ট গৃহ। এ তিনটি সৌভাগ্যের সম্পদ।

পক্ষান্তরে (দুর্ভাগ্যের প্রথম বস্তু হল,) এমন স্ত্রী; যাকে দেখলে তোমার মন তিক্ত হয়। যে তোমার উপর জিব লম্বা করে; এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তার এবং তোমার সম্পদের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পার না। (দ্বিতীয় হল,) নিস্তেজ সওয়ারী (পশু বা গাড়ি) যদি তাকে চালাবার জন্য প্রহার কর, তাহলে তোমাকে কষ্ট দেয় এবং যদি উপেক্ষা কর, তাহলে সঙ্গীদের সাথে মিলিত করে না। আর (তৃতীয় হল,) সংকীর্ণ ও অল্প কক্ষবিশিষ্ট গৃহ। এ তিনটি দুর্ভাগ্যের আপদ।” (সজাঃ ৩৫৫৬নং)

আর এ জন্যই কথায় বলে, ‘আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।’ অনুরূপভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও বিভিন্ন দিক লক্ষণীয়। অভিজ্ঞগণ বলেন, ‘দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্বদ্বারী তার প্রজা। পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।’

যেমন প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র দিয়ে গৃহকে সমৃদ্ধ করা কর্তব্য। অবশ্য এ সব বিষয়ে খেয়াল করে কোন গৃহনির্মাণ করা ব্যয়বহুল ব্যাপার; যা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবুও মুসলিম সামর্থ্য থাকতে চেষ্টার কমি করে না।

যাদের পক্ষে এরূপ বাড়ি করা সম্ভবপর নয় (গরীব হলেও ইজ্জতের জন্য) তারা বাড়ির প্রাচীরাদির অবশ্যই খেয়াল রাখবে। সেফ্‌টি পায়খানা না করতে পারলেও খাটা অথবা কুয়া পায়খানা করে নেবে। নচেৎ মহিলারা রাত্রিকালে পায়খানার অভ্যাস করবে। বাড়িতে পানির ব্যবস্থা না হলে, পুরুষরা বাইরে থেকে বহন করে এনে তার সুবন্দোবস্ত করবে। নতুবা মহিলারা রাত্রি-বেলায় পানি তুলে রেখে দিনে গোসলাদিতে ব্যবহার

করবে। বাইরে কোন খোলামেলা পুকুর বা কুয়া আদিতে মহিলাদের গোসল করা এবং একই ঘাটে নারী-পুরুষ সকলেই গোসলাদি করা মোটেই বৈধ নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে মহিলা নিজ গৃহ ছাড়া অন্য কোন জায়গায় নিজের কাপড় খোলে, আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল সে মহিলার পর্দা বিদীর্ণ করে দেন।” (আহমাদ, ত্বাবরানী, হাকিম, বাইহাকী, সহীহুল জামে ২৭০৮নং)

তিনি পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসলখানায় যেতে না দেয়।” (তিরমিযী, হাকিম, সহীহুল জামে ৬৫০৬নং)

৩। গৃহ নির্মাণের পূর্বে আর এক জরুরী দ্রষ্টব্য বিষয় প্রতিবেশী। যেহেতু প্রতিবেশীর উপর প্রতিবেশীর ভালো-মন্দে বড় প্রভাব পড়ে। আদান-প্রদান ব্যবহার ও সংসর্গে মানুষ ভালো হয়, আবার মন্দও।

মহানবী ﷺ সৎপ্রতিবেশীকে এক সৌভাগ্যের সম্পদ বলে বিবেচিত করেছেন।

আর অসৎ প্রতিবেশীকে হতভাগ্যের আপদ বলে পরিগণিত করেছেন। (সহীহুল জামে ৮৮৭নং)

যেমন তিনি অসৎ চরিত্রের প্রতিবেশী হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আর সকলকে এ মন্দ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ করতেন। (সহীহুল জামে ১২৯০,১৯৬৭নং)

পড়শীর কুপ্রভাব স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের উপর খুব সহজে পড়ে থাকে। পড়শী কুঁদুলে হলে সামান্য বিষয়ে বাড়ির ইজ্জত নষ্ট করে। প্রতিবেশী কোন রঙ্গমহল অথবা প্রেক্ষাপুরী হলে ছেলেমেয়েদের চরিত্র ও স্বভাব বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। পড়াশোনা ও বিভিন্ন ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটে।

গৃহের নিরাপত্তা

গৃহস্বামীর উচিত, পরিজনের স্বাস্থ্য ও বাড়ির নিরাপত্তার উপর বিশেষ খেয়াল রাখা। যেহেতু চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা অপেক্ষা পূর্ব হতেই রোগ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা করাই উত্তম। তাই যাতে কোন রোগ বা বিপদ না আসতে পারে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

এ বিষয়ে মহানবী ﷺ-এর কয়েকটি অনুদেশ প্রণিধানযোগ্য ঃ তিনি বলেন, “সন্ধ্যা হলে শিশুদেরকে বাইরে ছেড়ো না। কারণ এ সময় শয়তানদল ছড়িয়ে পরে। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। (শয়নকালে) সমস্ত দরজা অর্গলবদ্ধ কর এবং (সেই সাথে) আল্লাহর নামের স্মরণ নাও। আর আল্লাহর নামের স্মরণ নিয়ে বিভিন্ন (পাত্র-আধার ও) বাসনাদি ঢেকে রাখ। ঢাকার কিছু না থাকলে

অন্ততঃপক্ষে একটি কাষ্ঠখণ্ড (বা অন্য কিছু) দ্বারা ঢাক। আর (বিশেষ করে তৈল জ্বালিত) বাতিসমূদয় নির্বাপিত কর।" (বুখারী ১০/৮৮-৮৯)

কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খুলে না, কোন আবৃত পাত্রও খুলে না এবং ইঁদুর (তৈল জ্বালিত প্রদীপ দ্বারা) গৃহবাসীর উপর তাদের গৃহ জ্বালিয়ে দেয়।" (উননে অথবা গোয়ালে ধুঁয়া দিয়ে) আগুন ছেড়ে রেখো না। (বুখারী ১১/৮৫)

নবীজীর এ নির্দেশকে অবহেলা করে অনেক মানুষই উচিত শিক্ষা পেয়ে থাকে।

উপসংহার

হে শ্রদ্ধাস্পদ পিতা! আল্লাহকে ভয় করুন। আপনি গৃহকর্তা। আপনার দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। আপনি ঢিলা হলে সব ঢিলে হয়ে যাবে। আপনি নিদ্রাভিভূত থাকলে বাড়ির আর সবাই জাগার চেষ্টাও করবে না। আপনার স্কন্ধে এতগুলো লোকের নিষ্কৃতির দায়িত্বভার অর্পিত আছে। আপনি আল্লাহর এই কথাটি সর্বদা স্মরণ করুন, "তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর----।" (সূরা আত-তাহরীম (৬৬) : ৬)

হে স্নেহময়ী জননী! আল্লাহকে ভয় করুন। আপনার সন্তানকে ঈমানী দুগ্ধপান করিয়ে তাকে 'মানুষের মত মানুষ' করে গড়ে তুলুন। আপনি মা, আপনি শিশুর ভরসা। আপনার স্নেহ-ক্রোড় শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। আপনি আপনার কন্যার জন্য আদর্শ। তাকেও 'স্ত্রীর মত স্ত্রী' ও 'মায়ের মত মা' করে গড়ে তুলুন। পরিবার আপনার। পরিবেশও আপনারই হাতে। সেই পরিবেশকে সুন্দর, শান্ত, সম্ভ্রান্ত ও উন্নত করে গড়ে তোলার গুরুভার আপনার উপর। আপনি সে ভার দায়িত্ববোধের সাথে বহন করুন।

হে প্রেমময়ী, মমতাময়ী মাতা! সন্তানদের প্রতি আপনার প্রেম কত, মমতা কত! তাদের উপর একটু আঘাতে আপনার বক্ষে বজ্রাঘাত লাগে। গরম পানিতে কেউ পুড়ে গেলে তার জন্য আপনার অন্তরাত্মা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। অথচ জ্বলন্ত অনলে শিশু দগ্ধ হবে, তাতে আপনার কোন মাথাব্যথা নেই? তখন যদি আপনার ছেলে আপনাকে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে বলে, 'মা, মা-গো, জন্ম দিয়েছিলে, দুগ্ধপান করিয়েছিলে, কত মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করেছিলে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা হতে, কাঁটা ও ব্যথা হতে আমাকে জান দিয়ে রক্ষা করেছিলে, কিন্তু আজ আমাকে এ ভয়ঙ্কর আগুন হতে বাঁচাতে পারলে না মা?!' তখন আপনার বক্ষে কি নিদারুন বেদনার তীর আঘাত হানবে না? তখন কি মাতৃস্নেহ লৌহমুদ্‌গর হয়ে আপনার হৃদয়ে বার বার আঘাত হেনে আপনাকে নিষ্পিষ্ট করবে না? বাইরে লু চলছে, পাপ-ঝড়ের হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে মা! স্নেহবশে আপন শিশুকে ঘরে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে নিন। নচেৎ শিশুর কষ্টে আপনার অন্তর দগ্ধ হবে। অতএব আপনি যদি সত্য-সত্যই দরদী পরমা মা হন, তবে ছেলেদের ইহপরকালের শান্তি আপনার চিন্তার ও ভাবনার বিষয় হোক।

হে আলেম ও মুআল্লেম! আল্লাহকে ভয় করুন। আপনার ছাত্র ও শিষ্যের চরিত্র গঠনের ভার আপনার উপর। আপনার সুচরিত্রে তাদেরকে চরিত্রবান করুন।

হে নবীর ইলমের ওয়ারেস! এ মীরাস আপনার অমূল্য ধন, তা অবহেলায় হারিয়ে ফেলেন না। এ মীরাস এক সত্যের আলো। এ আলো দ্বারা আপনার জীবনের কালো তথা সমাজের পরিবেশের অন্ধকার দূর করুন। সত্য মীরাসের অপলাপ করা, স্বার্থবশে গুপ্ত ও লুপ্ত করা, দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করাতে আপনার কোন অধিকার নেই।

হে কল্যাণের শিক্ষক! আপনি জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, সুপথের দিশারী, ইসলামী বিজয় পতাকা উত্তোলনকারী। সমাজ আপনার প্রতি আশাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। আপনার নির্দেশের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা করছে। আপনার বাক্-তরবারি ও চরিত্র শক্তির অপেক্ষা করছে। আপনার প্রস্তুতি আপনি গ্রহণ করুন। যেন আপনার অবজ্ঞার ফলে এ বিজয়-নিশান অবনমিত না হয়ে যায়।

হে শ্রদ্ধাস্পদ ওস্তাদ! আপনার শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। অসঙ্গত কর্ম দ্বারা আমাদের সে হৃদয়াধার বিদীর্ণ করে সে শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে ধূলিধূসরিত করে ফেলেন না।

জী! আজ বাতিলতন্ত্রের ওস্তাদরা কুমন্ত্রের মায়াবলে আমাদের পরিবার ও পরিবেশের সর্বনাশ সাধন করে ফেলছে। আপনি তা দেখে ও বুঝেও কি তার প্রতিবাদে মহান আল্লাহর মনোনীত চিরন্তন অনুশাসনকে সমাজে বদ্ধমূল করতে প্রয়াসী হবেন না? হে উপদেষ্টা! যদি আপনার দ্বারা কোন এক ব্যক্তি সুপথ পায় তবে রাতুল উষ্ট্রী (সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ) হতে উত্তম সম্পদ সেটাই নয় কি? মহাশয়! একটি সত্য কথা হৃদয় হতে বের হলে তা হৃদয় তলে গিয়ে স্পর্শ করে এবং স্থায়ী হয়। কিন্তু একটি অলীক কথা জিহ্বা হতে বের হলে কর্ণও অতিক্রম করে না। আপনার কর্তব্যে আপনার হৃদয়-মন ও ইখলাস দিন। আপনার উপদেশমালা সকলের হৃদয়স্থ হবে।

হে মান্যবর মুদার্রিস! প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের আরোপিত ডিউটি পালনই আপনার কাম্য ও কর্ম নয়, আপনার একান্ত কাম্য দ্বীনী কর্তব্য পালন করা; মানুষ গড়া, 'আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ' গড়া।

হে জ্ঞান-ভাণ্ডার হেদায়াতকর্তা! জ্ঞানী জ্ঞান দ্বারা উপকৃত তখন হন, যখন জ্ঞানদানের পূর্বে সর্বাগ্রে নিজে তার অনুসারী হন, যেন আপনার কথা ও কাজে মিল থাকে।

{ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ}

"কি আশ্চর্য, তোমরা কি নিজেদেরকে বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর? তবে কি তোমরা বুঝ না?" (সূরা আল-বাক্বারাহ (২) : ৪৪)

আপনি পর্দার আয়াতের তর্জমা ও তফসীর পড়াচ্ছেন অথচ আপনার স্ত্রী-কন্যা বেপর্দা! আপনি (বুখারী শরীফের) 'ইস্তিহলালুল মাআযীফ'-এর হাদীস পড়েছেন ও পড়াচ্ছেন অথচ আপনিই মাআযীফ (বাদ্যযন্ত্র)কে হালাল জেনে আপনার গৃহ মুখরিত করছেন! আপনি মোহর দিয়ে বিবাহ করার আয়াত ও তার তফসীর পড়ে ও পড়িয়ে নিজে মোহর (পণ) নিয়ে বিবাহ করছেন ও দিচ্ছেন! 'কুল্লু মুস্কিরিন হারাম' পড়ে ও পড়িয়ে নিজেই (বিড়ি-সিগারেট, জর্দা, গুল-খৈনী প্রভৃতি) মাদকদ্রব্য ব্যবহার করছেন!

{كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}

"তোমরা যা কর না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতি রোষজনক।" (সূরা আস-সফ (৬১) : ৩)

উপকরণ থাকা সত্ত্বেও ঘরামির ঘর ভাঙ্গা থাকলে দুঃখের কথা নয় তো কি? নিজে পাওয়ার হাউস হয়েও নিজ গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখলে দুর্ভাগ্যের কথা বটে। এঁদের সাহায্যে পরিবেশ ও সমাজের উন্নয়ন সুদূর পরাহত। বরং অবনয়ন ও অধঃপতনই আশঙ্কিত।

মওলানা! কিন্তু কেন? কেন এ অবজ্ঞা, অবহেলা, শিথিলতা, দীর্ঘসূত্রতা কর্তব্যহীনতা, আত্মবিস্মৃতি ও কর্মবিমুখতা? সমাজ আজ বিপর্যস্ত। আলো-বাতাস ও পানি, সবই ফলেফুলে সুশোভিত সমাজ বৃক্ষের প্রতিকূল। পাপ ও কলঙ্কের কালিমা ও মেঘমালায় লুপ্ত সত্যের আলো। অশান্তি, আতঙ্ক, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অবিচার ও অরাজকতায় পরিবেশের বায়ু দূষিত। দুষ্কৃতি, নগ্নতা, অশ্লীলতা, নোংরামী ও ব্যভিচারে অনুকূল পানিও লবণাক্ত, সিঞ্চনের জন্য অনুপযুক্ত। ফলে যে অঙ্কুরিত হয়ে ফুলতে ও ফলতে চায় সেও অনুকূল পরিবেশ না পাওয়ার কারণে অকালেই নির্জীব হয়ে পড়ে।

সমাজের পরিবেশে পড়েছে ঘনঘটা কৃষ্ণ তমসাচ্ছন্ন বিভাবরী। সকলেই অলস নিদ্রাঘোরে সুষুপ্ত। আঁধার চিরে এ আঁধার পুরীতে আলো আনার কেউ নেই। কোন আহবানকারী নেই। আহবানে সাড়া দেবার কেউ নেই। নিদ্রার আলস্য ছেড়ে বিলাস শয্যার আমেজ ত্যাগ করে কে-ই বা মস্তকোত্তলন করে আহবানে কর্ণপাত করে?

হ্যাঁ জনাব! আপনি পারবেন। আল্লাহ আপনাকে ইল্‌ম দান করেছেন। আপনি আসুন নবারুণ হয়ে, সঙ্গে আনুন উষা। আসুন ঝটিকা হয়ে মেঘমালা অপসারিত এবং দোষাবহ বায়ু পরিবর্তিত করতে। আর সেই বারিদ আনীত হোক যাতে আছে অজস্র বারিধারা, যাতে ধরণী শ্যামল হয়ে উঠে, ফোটে ফুল, ফলে ফল ও ফসল।

গড়ে উঠুক সোনার সমাজ ও মুক্তার পরিবেশ।

এ সময় আর ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার সময় নয়। এ সময় একে অপরকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করার সময়। আত্মবিরোধ, গৃহবিবাদ ও আপোষ-দ্বন্দ্বের নয়, আত্মচেতনা, সন্ধি ও ঐক্য-মিলনের সময়। কিতাব ও সুন্নাহর সম্বল নিয়ে শির্ক বিদআত ও অন্যায়ের মূলে

কুঠারাঘাত করার সময়। এক অপরের গঠনমূলক সমালোচনা করে আপোষে যুক্তি ও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়।

হে ইমাম সাহেব! আপনি পেশ ইমাম। সকলের সম্মুখে থাকেন আপনি, লোক আপনার অনুসরণ করে। আপনি যেমনটি করেন সকলে তেমনটি করে। অতএব আপনি সকলের আদর্শ। আপনি হবেন সকলের নমুনা।

আপনার কর্তব্য সততা, ইখলাস এবং আল্লাহ-ভীতি। আপনার উচিত, সর্বপ্রকার আমল ও ইবাদতের পাবন্দ হওয়া, নিষ্ঠায় সকলকে বিমোহিত ও মুগ্ধ করা; যাতে মুক্তাদীগণের মন আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রতি আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হয়। আপনি সুন্দর চরিত্র ও বিনম্র ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করতে পারলে সত্যই আপনাকে সকল ক্ষেত্রে সকলের ইমাম বলে সকলেই মর্যাদা দিবে এবং আপনার মুক্তাদী হওয়ার চেষ্টা করবে।

আপনার উচিত, উপদেশ, নির্দেশ বা ওয়ায-নসীহতের সময় মানুষের মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা খেয়াল করা। যাতে হিতে বিপরীত না হয়ে যায়।

নির্দেশের সময় নম্রতা ও সমীহভাব অবলম্বন করা কর্তব্য। এতে সকলের মনে ছোঁয়া লাগবে। আপনি তাদের শুধু নামাযের নয়, বরং সর্ববিষয়ের ইমাম হবেন। দ্বীনী নির্দেশ দান হবে আপনার কর্তব্য। যেমন মসজিদে আপনি সকলের অগ্রণী থাকেন তেমনি বাইরেও আপনি অগ্রণী হবেন। শুধু মসজিদে মুক্তাদীগণের ইমাম, কিন্তু সমাজ ও পরিবেশের ক্ষেত্রে মুক্তাদীগণ আপনার ইমাম হলে বড় লজ্জার বিষয়।

অতএব জনাব! পরিবেশের স্রোতে গা না ভাসিয়ে সমাজকে গড়ার ঐকান্তিক চেষ্টা আপনার একান্ত কাম্য হওয়া উচিত।

হে তালেবে ইল্‌ম! আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তুমি জান্নাতের পথ অনুসরণ করেছ। অতএব তাঁরই উপর ভরসা রেখে সেই পথেই চল। ইলমের পথ; যে পথে আল্লাহ মুমিনকে মর্যাদায় উন্নীত করেন। (সূরা আল-মুজাদালাহ (৫৮) : ১১)

তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম ও জ্ঞানী তাঁরাই তাঁকে ভয় করে থাকে। (সূরা আল-ফাতির (৩৫) : ২৮)

অতএব তুমি আল্লাহকে ভয় কর। নিয়ত ও সংকল্পকে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় কর। আশাকে বড় কর। তোমার উদ্দেশ্য যেন অর্থোপার্জন না হয়। উদ্দেশ্য যেন দ্বীনী খিদমত ও ইসলামী পতাকা উন্নত করা হয়।

{وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ}

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (জীবনে তাকওয়া ও পরহেযগারী আনো)। আর আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা (জ্ঞান) দান করবেন।" (সূরা আল-বাক্বারা (২) : ২৮২)

গোনাহ্ ত্যাগ করলে তোমার স্মৃতিশক্তি আরো বৃদ্ধি হবে। গোনাহ করতে থাকলে প্রকৃত ইল্‌মের নাগাল পাবে না। কারণ ইলম আল্লাহর নূর; যা কোন পাপীকে দান করা হয় না।

হে দ্বীনী শিক্ষার্থী! যা শিখছ ও জানছ, তা কাজে পরিণত কর। কারণ এ শিক্ষা (ইল্‌ম) তোমার মুক্তির জন্য তোমার স্বপক্ষে দলীল স্বরূপ। অথবা (আমল না করলে) তোমার ধ্বংসের জন্য তোমার বিরুদ্ধে দলীল স্বরূপ। আল্লাহ বলেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ}

“তাদেরকে এ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি নিদর্শনাবলী (আয়াত ও ইল্‌ম) দান করেছিলাম অতঃপর সেগুলিকে বর্জন করে ও শয়তান তার পিছনে লাগে। আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।” (সূরা আল-আ'রাফ (৭) : ১৭৫)

হে কুরআন ও হাদীসের বিদ্যার্থী! যদি জ্ঞান ও শিক্ষা তোমার কোন উপকারই না করতে পারে, তবে বৃথা সময় ও অর্থ ব্যয় করে লাভটা কি? যে বুঝ্ তোমাকে বিপদে ফেলে সে বুঝ্ না বুঝাই উত্তম নয় কি? বিনা আমলের ইলম্ থেকে মূর্খতাই অধিক ভালো।

অতএব তোমরা পণ কর যে, তোমরা ফুলের মত জীবন গড়বে। সুগন্ধ বুকে লুকিয়ে রেখে সহজ সুখে হেসে সবার মন জুড়িয়ে দেবে। নদী যেমন উভয় কূলে পানি বিলিয়ে ফুল-ফল-ফসল ফুটিয়ে তোলে, তেমনি করে তোমরা পরের ভালো ও সেবা করবে। দূর করবে পরিবেশের এ কালিমা, আবর্জনা, পঙ্কিলতা ও মলিনতাকে। আর বলবে,

‘সূর্য যেমন নিখিল ধরায় করে কিরণ দান,
আঁধার দূরে যায় পালিয়ে জাগে পাখীর গান।
তেমনি মোদের জ্ঞানের আলো
দূর করিবে সকল কালো,
উঠবে জেগে ঘুমিয়ে আছে যে সব নীরব প্রাণ।’

আল্লাহ তোমাদেরকে সেই তৌফীক ও প্রয়াস দান করুন। আমীন।

সমাজ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কয়েকটি ধর্মীয় নীতি

১-

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}

“তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়া (আত্মসংযম ও কর্তব্যপরায়ণতায়) পরস্পর সাহায্য কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না।” (সূরা আল-মায়িদা (৫) : ২)

২-

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

“মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু। এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে বাধা দান করে। যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।” (সূরা আত-তাওবাহ (৯) : ৭১)

৩-

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}

“মুমিনদের দু’দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে অন্যায় আক্রমণ করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা করবে এবং সুবিচার করবে। যারা ন্যায় বিচার করে, তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।” (সূরা আল-হুজরাত (৪৯) : ৯)

৪-

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

“মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।” (সূরা আল-হুজরাত (৪৯) :১০)

৫-

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

"হে ঈমানদারগণ! কোনও পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর কোন নারীও যেন কোন অপর নারীকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কারো ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরণের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী।" (সূরা আল-হুজরাত (৪৯) :১১)

৬-

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ}

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান করা হতে দূরে থাক; কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান (বা ধারণা) করা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না ও একে অন্যের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভায়ের মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" (ঐ ৪৯/১২)

৭-

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে; যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন

যে অধিক পরহেযগার (আল্লাহভীরু)। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" (ঐ ৪৯/১৩)

৮- "সাবধান! অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা, অযথা ধারণা (পোষণ করা) সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করো না, পরস্পরের ত্রুটি অনুসন্ধান করো না, রিষারিষি করো না, পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, আল্লাহর বান্দারা ভাই-ভাই হয়ে যাও; যে ভাবে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। এক মুসলিম আর এক মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করতে পারে না। তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞাও করতে পারে না। তাকওয়া এখানে (অন্তরে)। কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম।" (বুখারী, মুসলিম, প্রমুখ)

৯- "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে অপরকে ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই কাউকে কিছু দেওয়া হতে বিরত থাকে সে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানের অধিকারী।" (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)

১০- "যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় এবং তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে সে মুমিন নয়।" (মিশকাত ৪৯৯১নং)

১১- "যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না সে ব্যক্তি মুমিন নয়।" (ত্বাবরানী, সহীহুল জামে ৫৩৮০নং)

১২- "প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, তুমি (পূর্ণ) মুমিন হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য কর, তাহলে (পূর্ণ) মুসলিম হয়ে যাবে।" (তিরমিযী)

{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

মহান রবের প্রথম আদেশ হল, পড়---। পড়---।

বই পড়ুন। অপরকে পড়তে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করুন।